بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IOM

“নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত”

Subject: RAM 302

Submitted To:

Ustaz Abdul wahid.

Submitted by:

Mst. ………………….

Roll: 1902034; 6th semester.

Date: 30/5/2022

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم! وبعد:

কালেমা স্বীকৃতির পরই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে নামায। সকল প্রশংসা মাত্রই জগতসমূহের রব মহান আল্লাহর জন্য, যার প্রদত্ত তাওফীকে **"নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত"** নামক এসাইনমেন্টটি সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর; যিনি নামাযকে কাফির ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী সাব্যস্ত করেছেন। রচনাটিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

"নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার যাবতীয় 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত) ।" (সূরা আল আনয়াম, আয়াত-১৬২)।

সূচীপত্রঃ **পৃষ্ঠা**

সারসংক্ষেপ

কুরআনুল কারিমে নামাযের ব্যপারে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, আশির অধিক জায়গায় নামাযের আলোচনা এসেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ললাম শতাধিক হাদীসে যথাযথভাবে নামা**য** পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। নামায হচ্ছে দীনের খুঁটি বা স্তম্ভ। ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে যে কটি মৌলিক আমলের ওপর, তার মধ্যে নামায সর্বাগ্রে। নামাযের প্রভাব সর্বজন স্বীকৃত। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও গুনাহ থেরে ব্যক্তিকে বিরত রাখার ব্যাপারে নামাযেরর জুড়ি নাই। কোনে বান্দা যখন আল্লাহ তাআলাকে হাজির নাযির জেনে; আল্লাহ তার সম্মুখে আছেন, তাঁর নামায প্রত্যক্ষ করছেন, এই ধ্যান করে। খুশুখুযু তথা বিনয়, স্থিরতা ও প্রেমভয় নিয়ে নিয়মিত নামায আদায় করতে থাকে। তখন এই নামায রিপুর দোষ থেকে তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেয়। জীবনকে পরিশীলিত করে তোলে। অন্যায় ও অপরাধ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে আনে। এই নামায সততা, সাধুতা, আল্লাহ প্রেম ও খোদাভীতির গুণ তাকে উপহার দেয়। এ জন্যই ইসলামে নামাযের এত গুরুত্ব, সমস্ত ফরয ইবাদতের উপর নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব। এবং এই কারণেই নবীজীর আদত ছিলো, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তাকে নামায আদায়ের আদেশ দিতেন, অঙ্গীকার নিতেন।

ইমাম আহমদ রহ. তার "কিতাবুস সালাতে" বলেন, "তুমি জেনে রাখ! ইসলামে তোমার অংশ আর তোমার নিকট ইসলামের গুরুত্ব ততটুকু যতটুকু সালাতে তোমার অংশ এবং তোমার নিকট সালাতের গুরুত্ব এবং তুমি এমন অবস্থা থেকে বাঁচ যে, তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করছ, আর তোমার নিকট ইসলামের কোনো গুরুত্ব নেই, কেননা তোমার অন্তরে ইসলামের ততটুকুই গুরুত্ব হবে যতটুকু তোমার অন্তরে সালাতের গুরুত্ব থাকবে।"

কালেমায়ে তাইয়্যেবার পরে প্রথম বাস্তব আমলী স্বীকৃতি হলো নামায। কালেমায়ে তাইয়েবার মধ্যে যে দুটো কথা স্বীকার করা হয় তা বাস্তব জীবনে মেনে চলার ট্রেনিংই হলো নামায। কালেমা ও নামাযের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়ে কালেমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণ করে তবে সে তার জীবনে দুটি মূলনীতি ঘোষণা করে- ১. আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব। আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম পালন করবনা। ২. রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হুকুম যে নিয়মে পালন করেছেন, আমি একমাত্র ঐ নিয়মেই আল্লাহর হুকুম পালন করব। আর কারো কাছ থেকে কোন নিয়ম বা পদ্ধতি গ্রহণ করব না। এ ঘোষণার ফলে সে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে কালেমায়ে তাইয়্যেবা কবুল করে ইসলামের ৫টি ভিত্তির প্রথমটি গ্রহণ করার ঘোষণা দিল। এখন বাকী ৪টি ভিত্তি তাকে মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে প্রথমে নামায। কালেমা কবুলের সাথে সাথেই তার উপর নামায ফরয হয়ে গেল। রমযান মাস আসলে তাকে রোযা রাখতে হবে। তার নিকট যাকাত দেবার নেসাব পরিমাণ মাল থাকলে এক বছর পর যাকাত আদায় করবে। হজ্জ করার সাধ্য থাকলে হজ্জের মওসুমে হজ্জ আদায় করবে। কিন্তু নামায এমনই এক ইবাদত যা কালেমা কবুলের পর পরবর্তী নামাযের ওয়াকতেই তাকে আদায় করতে হবে।

নামাযের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'নামায বেহেশতের চাবি'। (জামে' আত-তিরমিজি,পবিত্রতা,৪) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তার বান্দার সরাসরি যোগাযোগ

স্থাপিত হয়। আর এ জন্যই একজন মুসলিমের জীবনে নামাযেরর গুরুত্ব অনেক, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় ইবাদত হলো নামায।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'নামায'। (বুখারি ও মুসলিম)

নামায এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে কুফর এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কোন ব্যক্তি ঈমানদার আর কোন ব্যক্তি কাফির তার স্পষ্টত ফারাক হলো নামাজ। কারণ মুমিন ব্যক্তি যেকোনো অবস্থাতেই প্রত্যহ পাঁচবার নামায আদায় করবে, আর কাফির ব্যক্তি নামায থেকে দূরে থাকে। এ সম্পর্কে জাবির রা: বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কুফর ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।' (সুনানে তিরমিজি-২৬১৮, সহিহ ইবনে মাজাহ-১০৭৮, মুসলিম)

হুসায়ন ইবনে হুরায়স রহ. বুরায়দা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিলো সে কুফরি করল।' (সুনানে নাসায়ি-৪৬৪, সহিহ ইবনে মাজাহ-১০৭৯)।

আনাস ইবনু হাকীম আদ্-দাব্বী থেকে বর্ণিতঃআবূ হুরায়রা (রাঃ) সরসরি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের 'আমাল সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের সালাত সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। (আবু দাউদ-৮৬৪) সুতরাং তা যদি সঠিক হয় তাহলে সে পরিত্রান পাবে । আর যদি পণ্ড হয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, নামায সর্বোপরি দুনিয়া আখিরাত সব জীবনের জন্যই একটি কল্যাণকর ইবাদত। তাই মুমিনের জীবনে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম।

১. ভূমিকা

ইসলামের মূল রুকন বা স্তম্ভ পাঁচটি। কালেমার সাক্ষ্য দেওয়ার পর নামাযইই ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদত। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা নামাযকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন। যেমন তাঁর বাণী:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡ﴾ [البقرة: ١٤٣]

''আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত)-কে নষ্ট করে দিবেন।'' **

**এখানে ক্বিবলা পরিবর্তনের একটি উদ্দেশ্যর কথা বলা হচ্ছে। নিষ্ঠাবান মু'মিনরা তো কেবল আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর চোখের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকতেন। কাজেই তাঁদের জন্য একদিক থেকে অন্য দিকে ফিরে যাওয়া কোন সমস্যার ব্যাপার ছিল না, বরং একটি মসজিদে তো ক্বিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ তখন পৌঁছে, যখন তাঁরা রুকু'তে ছিলেন। তাঁরা রুকু'র অবস্থাতেই নিজেদের মুখমন্ডল কা'বার দিকে ফিরিয়ে নিলেন। এটাকে 'মসজিদে ক্বিবলাতাইন' (অর্থাৎ, সেই মসজিদ যেখানে একটিই নামায দু'টি ক্বিবলার দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে।) বলা হয়। অনুরূপ ঘটনা ক্বুবার মসজিদেও ঘটেছে। কোন কোন সাহাবা (রাঃ)-এর মনে এই সমস্যার উদয় হল যে, যে সাহাবাগণ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার যুগে মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা আমরা যতদিন সেদিকে মুখ করে নামায পড়েছি, সে সবই মনে হয় বিফলে গেছে, তার মনে হয় কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বললেন, তোমাদের ঐ নামাযগুলো ব্যর্থ হবে না; বরং তোমরা তার পূর্ণ সওয়াব পাবে। আর এখানে নামাযকে বিশ্বাস বা ঈমান বলে আখ্যায়িত করে এ কথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, নামায ব্যতীত ঈমানের কোন মূল্য নেই। ঈমান তখনই ঈমান বলে গণ্য হবে, যখন নামায ও আল্লাহর অন্যান্য বিধানসমূহের যত্ন নেওয়া হবে।[১]

পবিত্র লাইলাতুল মিরাজের সময় মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য হাদিয়া(উপঢৌকন)স্বরূপ ৫০ ওয়াক্ত নামাযের বিধান নিয়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি নামাযের ওয়াক্তের পরিমাণ আল্লাহর কাছ থেকে কমিয়ে আনার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়ে ওয়াক্তের পরিমাণ কমানোর জন্য একাধিকবার আর্জি পেশ করলে তা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। ফলশ্রুতিতে, ওয়াক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ (পাঁচ)। [২]

নামায একটি ফরজ তথা আবশ্যক ইবাদত। সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণকে হৃদয়ে সঞ্চারিত রাখার প্রক্রিয়া হিসাবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

إِنَّنِیَ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَاْ فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىٓ ١٤-

''আমিই আল্লাহ। আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। ''
[৩]

নামাযের আবশ্যকতার তাকিদ দিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়া'লা ইরশাদ করেন-

(١٣ :المجادلة)   فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ

"তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর"[৪]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন। [৫]

নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ]."رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ,[ ]وَمُسْلِمٌ.[

আবু আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবন উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, “পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে— সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা‘বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাতকায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এবং রমাদানের সওম পালন করা।” [৬]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَه عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَه وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَه عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَه. رَوَاهُ أَحْمَد وأَبُوْ دَاوُدَ وروى مالك وَالنَّسَائِيُّ نحوه

‘উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, যা আল্লাহ তা’আলা (বান্দার জন্য) ফারয্ করেছেন। যে ব্যক্তি এ সলাতের জন্য ভালভাবে উযূ করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকূ’ ও খুশুকে পরিপূর্ণরূপে করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া’দা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া’দা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। মালিক এবং নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [৭]

১.১. সালাত বা নামায কি এবং কেন?

صلاة (সালাত) আরবি শব্দ, বহুবচনে **اَلصَّلَوَات** (সালাওয়াত)। "সালাত" এর আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ: দোয়া, রহমত, নত হওয়া, অনুসরণ করা, উপাসনা, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝায় । আযানের ভাষ্য অনুসারে সালাতের অপর নাম **الفلاح** (ফালাহ) অর্থাৎ সাফল্য। (হাই আলাল ফালাহ: সাফল্যের জন্য এসো) এবং **خير** (খয়র) অর্থাৎ উত্তম। (আস্ সালাতু খয়রুম মিনান্নাউম: ঘুম থেকে নামাজ উত্তম)।[৮] সূরা আল-আ'লার ১৪-১৫ নাম্বার আয়াতেও সালাত কায়েমকারীকে সফল (فلاح) বলা হয়েছে।

সালাতের প্রাণ হচ্ছে খুশুখুযু যা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের (connection) অনুভব সৃষ্টি করে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভব মানবজনমকে চূড়ান্ত সফলতার দিকে নিয়ে যায়। সালাত শব্দের ধাতুমূলের একটি অর্থ 'সংযোগ' বা connection। বিশেষ করে কম্পিউটার, টেলিকম, সাইকোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ **صلاة** এর একই ধাতু থেকে উদগত **اِتَّصال** (communication, connection, union, linkage), **مُتَّصِلَة, تُوَاصِل, المُوصِل** শব্দগুলো 'সংযোগ' অর্থে বহুল ব্যবহৃত। এজন্যই ইসলামের প্রধান হুকুম সালাত। কেননা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কানেকশান'-ই মানবজনমের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য। আর সালাত হলো এই সংযোগের প্রধান চর্চা। দিনে পাঁচবার সালাত আদায়ের মাধ্যমে সারাদিন আমরা আল্লাহর সাথে সংযোগ অনুশীলন করি। সালাত ছাড়া ইসলামের বাকি সব হুকুম বেকার হয়ে যায়, ইসলামের পুরো কাঠামোটা আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন একটা মতবাদে পরিণত হয়ে যায়। [৯]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, মানুষের নিকট সালাতের গুরুত্ব যতুটুকু, ইসলামের গুরুত্বও ঠিক ততটুকু। সালাতের প্রতি মানুষের যতটুকু আকর্ষণ পাওয়া যাবে, বুঝে নিতে হবে ইসলামের প্রতিও তার ঠিক ততটুকুই আকর্ষণ রয়েছে। একজন মুসলিমের জীবনযাপনের চালিকাশক্তি তার সালাত। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যদি হয় মানবজনমের সার্থকতা, তবে সালাতই আমাদের প্রধান কাজ। যার সালাত সুন্দর, তার জীবন সুন্দর, সে সার্থক। এলোমেলো অগোছালো উদ্দেশ্যহীন জীবনে হতাশা-শূন্যতা পেয়ে বসে। সালাত ঠিক করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সংযোগ মেরামত করতে পারলে, জীবন ঠিক হয়ে যাবে। সালাতের ভেতর আল্লাহর সাথে সংযোগ হলে তা সালাতের বাইরেও আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে আল্লাহর সাথে সংযোগের অনুভূতিতে।

১.২. নামায (নামাজ): সালাতের আঞ্চলিক নাম

নামায শব্দটি ফার্সি: **نماز** শব্দ থেকে উদ্ভূত। আরবী **صلاة** (সালাত) শব্দের সমার্থকরূপে **نماز** (নামায/নামাজ) শব্দটি একাধারে উপমহাদেশীয় অঞ্চলের বাংলাদেশে বাংলা ভাষায়, ভারতে হিন্দি এবং পাকিস্তানে উর্দু ভাষায় একীভূত এবং বহুল প্রচলিত।

১.৩. ইসলামী শারীয়াতের পরিভাষায় সালাত বা নামায

ইসলামী পরিভাষায় শারিয়াহ নির্ধারিত তথা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আমলকৃত কতিপয় আহকাম-আরকান সহকারে বিশেষ বিশেষ ওয়াক্ত বা সময়কালে আদায়কৃত বিশেষ ইবাদাত-কে সালাত বা নামায বলে।

১.৪. সালাত বা নামায কাদের জন্য আবশ্যক?

সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন কোন বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মানুষ যে ওয়াক্তে ঈমান এনে পবিত্র দীন ইসলাম গ্রহণ করলে কিংবা এমন বালেগ মুসলমান- যাঁরা সহীহ হাদীস বর্ণিত ৭ কিংবা ১০ বছর বয়সকালে নামাযে অভ্যস্ত হননি, বালেগ হওয়ার পর যদি নামায আদায় করতে হয় তাহলে বালেগ হওয়ার আগ থেকেই শরা-শরীয়াতমত অযু, গোসল, নামাযের প্রয়োজনীয় হুকুম আহকাম, নিয়ম কানুন জেনে নেয়া কর্তব্য। কারণ, যে ওয়াক্তে সাবালকত্ব লাভ করেছেন সেই ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরযে আঈন অর্থাৎ অবশ্যই পালনীয় হয়ে যায়।

স্ত্রী-সন্তান সন্তিদের সালাত কায়েমের নির্দেশ দিতে হবে, কারন সালাত কায়েম করা ফরয ইবাদাত।

٦ -يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّـهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ◯

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশ্তাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে। [১০]

সারবা ইবনু মাবাদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে সাত বছর বয়সে সালাত (নামায) কায়েমের আদেশ দেবে। যখন তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন সালাতের জন্য মৃদু প্রহার করবে। [১১]

٩ -يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ◯

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত"। [১২]

মুফাসসিরে কিরাম বলেন, আলোচ্য আয়াতে "আল্লাহর যিকর" দ্বারা ৫ ওয়াক্ত সালাত (নামায) বুঝানো হয়েছে। সুতরাং, যে ব্যক্তি যথাসময়ে সালাত আদায় হতে গাফিল (অমনোযোগী) হয়ে বেচাকেনা উপার্জন, জীবিকা সংগ্রহ ও সন্তান-সন্ততির সাথে খেল-তামাশায় বিভোর থাকবে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। [১৩]

১.৫. সালাত (নামায):আল্লাহর পথে শ্রেষ্ঠ দাওয়া

ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি (Foundation) ৫টি- যার শুরু ঈমান দিয়ে আর আমল শুরু সালাত বা নামায দিয়ে। হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম যে আমলটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সেটি হচ্ছে সালাত বা নামায। দুনিয়াবী জীবন-জিন্দেগীতে যার নামায়ে আমলে নামায থাকবে, আখেরাতে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে অর্থাৎ তার কপালে

জান্নাত জুটবে, যার অর্থ হচ্ছে পুলসিরাত বিজলীর মত পার হয়ে ৮ জান্নাতের যেকোন একটিতে দাখিল হওয়া আর জান্নাত মানেই ‘‘সালামান সালামা’’ অর্থাৎ ‘‘শান্তি আর শান্তি’’।

সুতরাং, সর্বোত্তম দীনী দাওয়াত হচ্ছে ঈমানী দাওয়াত, যে ঈমান একজন কাট্টা অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাসী করে নামাযী হওয়ার অধিকারী করে থাকে। প্রকৃত ঈমানদার প্রকৃতপক্ষে যদিও বেনামাযী হতে পারে না, তবুও বাস্তব সত্য যে, ঈমানদারদের মধ্যেই নামাযের গুরুত্ব না বুঝার কারণে হোক কিংবা গুরুত্ব বুঝার পরও ‘‘মন চায় না তাই নামায পড়া যায় না’’-এ বলে অনেকে নামাযে আগ্রহী হন না অর্থাৎ নামায আদায় করা যে মুসলমান হিসাবে ফরযে আ'ঈন (অবশ্যই পালনীয়)-এই গুরুত্ব জানলেও নামায আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতির গুরুত্ব না বুঝার কারণে অনেকে নামাযের প্রতি যত্নবান হন না। তাই দাওয়াতুল ইসলামের মাধ্যমে নামায না পড়ায় আখেরাতে কি সমস্যা হতে পারে তা তুলে ধরা উত্তম দাওয়াত হতে পারে।

১.৬. নামাযের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহপাকের বর্ণিত কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আয়াত সমূহ-

আল্লাহ হেদায়াত প্রাপ্ত মুত্তাকীদের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন ‘‘যারা অদৃশ্যের বিষয়গুলোতে ইমান আনে এবং নামাজ কায়েম করে’ (সূরা বাকারা, আয়াত-৩)।

‘আর তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো; জাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো’ (সূরা বাকারা, আয়াত-৪৩)।

‘হে নবী! আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন তাদের বলুন, নামাজ কায়েম করতে’ (সূরা ইবরাহিম, আয়াত-৩১)।

‘তোমরা লোকদের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং নামাজ আদায় করবে’ (সূরা বাকারা, আয়াত-৮৩)।

আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘তুমি বলে দাও, আমার রব ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় তোমাদের মুখমণ্ডল স্থির রেখো’ (সূরা আরাফ, আয়াত-২৯)।

‘অতএব, আল্লাহকে সিজদা করো এবং তার ইবাদত করো’ (সূরা নাজম, আয়াত-৬২)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।’ (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৪৫)

‘যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আমি এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না’ (সূরা আরাফ, আয়াত-১৭০)।

‘মুমিনরা নামাজ আদায় করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন’ (সূরা তাওবা, আয়াত-৭১)।

মানুষের জীবনে কোনো বিপদ-আপদ এলে একজন প্রকৃত মুমিন বান্দার উচিত ধৈর্য্য ধারণ করা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং অবশ্যই তা নামাজের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাজের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন’ (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৩)।

‘অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব নামাজ পড়ো। আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে’ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৯)।
‘নামাজ কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো। তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে’ (সূরা আল আনয়াম, আয়াত-৭২)।
‘বলো, আমার নামাজ, আমার ইবাদতের সমস্ত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য’ (সূরা আল আনয়াম, আয়াত-১৬২)।

২. নামায কেন গুরুত্বপূর্ণ?

যাবতীয় ফরয বিষয় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মারফত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ফরয হয়েছে, কিন্তু সালাতের জন্য তাঁকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; যেখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সাথে কথপোকথন করেন এবং তাঁর প্রতি (পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। অতঃপর তা থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত বাকী রাখা হয় যার নেকী ৫০ ওয়াক্তেরই সমান।[২ঐ] তাই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজকে ঈমানের পর স্থান দিয়েছেন।

নামাজের গুরুত্ব ও ফায়েদা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো-

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةِ لَوَقْتِهَا

‘’আবদুল্লাহ (রাঃ)] ইবনু মাস্‘ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ (‘আমাল) আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা।‘’ [১৪]

উল্লেখিত হাদিস বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার আল্লামা মোল্লা আলি ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘এ হাদিসের মাধ্যমেই আলেমগণ ঈমানের পর নামাযকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা মনোনীত সর্বোত্তম আমল হলো নামায। অতএব যে বেশি বেশি নামায পড়তে সক্ষম, সে যেন বেশি বেশি নামাজ পড়ে। [১৫]

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ . أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ . فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً " . قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ .

মা’দান ইব্নে তালহাহ্ আল ইয়া’মারী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রাঃ) -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, আমাকে একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর প্রিয়তম ও পছন্দনীয় কাজের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। আমি পুনর্বার জিজ্ঞেস করলাম। এবারও তিনি নীরব থাকলেন। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেনঃ তুমি আল্লাহর জন্য অবশ্যই বেশি বেশি সাজদাহ্ করবে। কেননা তুমি যখন আল্লাহ্র জন্য একটি সাজদাহ্ করবে, আল্লাহ্ তা’আলা এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করে দিবেন। মা’দান বলেন, অতঃপর আমি আবূ দার্দাহ্ (রাঃ) -এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সাওবান (রাঃ) আমাকে যা বলেছেন, তিনিও তাই বললেন। [১৬]

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের গুরুত্ব বুঝাতে হাদিসের মাধ্যমে একটি উপমা প্রদান করেছেন। হজরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় শীতকালে বাইরে তাশরিফ আনলেন। তখন গাছের পাথা ঝরার মওসুম ছিল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের একটি ডাল হাত দিয়ে ধরলেন। ফলে তার পাতা আরও বেশি ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু যর! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন- ‘মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করে, তখন তার থেকে পাপসমূহ ঝরে পড়ে; যেমন এ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। [১৭]

নামাযই একমাত্র ইবাদত; যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার সব কাজ ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। এ নামাজই মানুষকে দুনিয়ার সব পাপ-পংকিলতা থেকে ধুয়ে মুছে পাক-সাফ করে দেয়। দুনিয়ার সব অন্যায়-অনাচার থেকে হেফাজত করে। নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিন মুসলমানরে ঈমানের দাবি ও ফরজ ইবাদত। নামাজি ব্যক্তিই হলো সফল। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন প্রিয়নবি। তিনি বলেছেন-

»من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلفً«

‘যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে; কেয়ামতের দিন ওই নামায তার জন্য নূর হবে এবং হিসেবের সময় নামায তার জন্য দলিল হবে এবং নামায তার জন্য নাজাতের কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযেরর প্রতি যত্নবান হবে না- কেয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর ও দলিল হবে না। তার জন্য নাজাতের কোনো সনদও থাকবে না। বরং ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে।’ [১৮]

উপরের আলোচনা থেকে নামাযের গুরুত্ব স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। শুধু আমাদের শরীয়তে নয়, বিগত শরী'আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী'আত সালাতবিহীন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুলকারীমে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দুয়া সম্পর্কে বলেন,

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ﴾ [ابراهيم: ٤٠]

"হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।" [১৯]

এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا﴾ [مريم: ٣١]

"এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।" [২০]

এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِوَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا ٥٥ ﴾ [مريم: ৫৫]

"সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।" [২১]

ইসলামের শুরুর দিকে মহান আল্লাহ দুই রাকাত নামায সকালে ও দুই রাকাত নামায সন্ধ্যার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। সকাল-সন্ধ্যার ইবাদত নবুয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকেই ছিল। ইবনে হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মেরাজের ঘটনার আগেই নামায আদায় করতেন। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে অন্য কোনো নামাজ ফরজ ছিল কি না। কেউ কেউ বলেন, সূর্য উদয় হওয়ার আগে ও অস্ত যাওয়ার আগের এক একটি নামায ফরজ ছিল। বারা ইবনে আজেব (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও এ ধরণের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, "এই নামায ছিল প্রথম দিকে ফরজের অন্তর্ভুক্ত"। [২২]

ইবনে হিশাম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন (ইসলামের সূচনাকালে) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম নামাজের সময় পাহাড়ে চলে যেতেন এবং গোপনে নামাজ আদায় করতেন। একবার চাচাজান আবু তালেব রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ও আলী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে নামাজ পড়তে দেখে ফেলেন। তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁকে জানানোর পর তিনি (আবু তালেব) বলেন, "এই অভ্যাস অব্যাহত রেখো"। [২৩]

গুনিয়াতুত তালেবিন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হজরত আদম আ'লাইহিমুস সালাম যখন দুনিয়ায় পতিত হলেন তখন আসরের ওয়াক্ত ছিল। দেখতে দেখতে সূর্য লাল বর্ণ ধারণ করল এবং ধীরে ধীরে ডুবে গেল। সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। হজরত আদম আ'লাইহিমুস সালাম ছিলেন জান্নাতে। সেখানে অন্ধকারের নামগন্ধও ছিল না। সুতরাং তিনি জীবনেও কোনো অন্ধকার দেখেননি। ফলে তিনি অন্ধকারে ভয়ঙ্কর রকমের ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। আর এ অন্ধকারের মধ্যে ভয়ানক জীবজন্তুর ভীষণ তর্জন-গর্জন শুনতে পেলেন। ভয়াবহ অন্ধকারে সারা রাত কাটালেন। ভোরে সূর্যোদয় হলো। তা দেখে আদম আ'লাইহিমুস সালাম এর মনে আশার সঞ্চার হলো। হজরত জিবরাইল আ'লাইহিমুস সালাম এসে আদম আ'লাইহিমুস সালামকে জাগ্রত করে সুবহে সাদিকের সুসংবাদ দিলেন। বললেন হে আদম! উঠুন,আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। দেখুন অন্ধকার গত হয়ে সূর্য উদয় হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত হয়ে হজরত আদম আ'লাইহিমুস সালাম দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করলেন। এক রাকাত সেই ভীষণ অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার কারণে আর এক রাকাত দিনের আলো প্রকাশ হওয়ার কারণে। এটি মানবজাতির প্রথম নামাজ ছিল; যা আদম আ'লাইহিমুস সালাম একসঙ্গে দুই রাকাত নামাজ

আদায় করেছিলেন। জনৈক আনসারি সাহাবি নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! ফজরের নামাজ সর্বপ্রথম কোন নবী পড়েছিলেন? প্রত্যুতরে তিনি বললেন, ফজরের নামাজ সর্বপ্রথম হজরত আদম (আ.) পড়েছিলেন। [২৪]

অর্থাৎ মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই নামাযই ছিলো আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সংযোগের অন্যতম মাধ্যম।

নামায ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة»

''মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়া''। [২৫]

তিনি আরো বলেন,

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

''আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।'' [২৬]

প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবন আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, ''সাহাবায়ে কিরাম সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী মনে করতেন না।'' [২৭]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ''যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।''

উল্লিখিত ও অন্যান্য দলীলসমূহ সালাত পরিত্যাগকারী বড় কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ; যদি সে পরিত্যাগকারী ব্যক্তি সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে। আর এ মত পোষণ করেন ঈমাম আহমদ রহ. এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন:

«أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة»

''সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনের যা হারাবে তাহলো সালাত''। [২৮]

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, ''সুতরাং ইসলাম থেকে চলে যাওয়া সর্বশেষ বস্তু যখন সালাত তখন যে বস্তুর শেষ চলে যায় সে বস্তু সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এ জন্য আপনাদের দীনের সর্বশেষ অংশ (সালাত)-কে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরুন, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।'' [২৯]

বর্তমান যুগে আমাদের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কুফুরীর ফাতওয়া দিয়েছেন, আর তাদের শীর্ষে রয়েছেন, মাননীয় (সাবেক) মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায ও আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীন রহ.।

তবে ইমাম আবু হানিফা রহঃ এবং ইমাম শাফঈ রহঃ অলসতাবশত বা অন্য কোন নামায ছেড়ে দেওয়াকে ফাসিকী বলেছেন। কারন হাদীসের দলিল থেকে আমরা জানি যার অন্তরে ঈমান আছে সে জান্নাতে যাবে। নামায ছেড়ে দেয়া মারাত্মক গোনাহের কাজ এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই ; এটি কাফেরদের মত কাজ। কিন্তু ব্যক্তি এতে করে কাফের হয়ে যায় না বরং কাফেরদের মত কাজ হয়। যদি কাফের হয়ে যেত তাহলে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীস আসতো। অথচ নামায ছেড়ে দিলে চিরস্থাইয়ী জাহান্নামী হবার কোন হাদীস বা আয়াত বর্ণিত হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলা এবং রাসূল সাঃ পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন শিরক ছাড়া আর যত গোনাহই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা তা মাফ করে দিতে পারেন। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ নামায পড়া ফরজ নয় মনে করে নামায ছেড়ে দেয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি কাফের। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিংবা নামাযকে তাচ্ছিল্য করে নামায পড়া ছেড়ে দেয় তাহলেও উক্ত ব্যক্তি কাফের।

অতএব, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ এবং পরিপুর্ন মুসলিম হতে হলে নামায কায়েমের কোন বিকল্প নেই। মুমিনের জীবনের সকল কাজ নামাযকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে হবে।

৩. নামাযের ফযীলত বা উপকারীতা

দুনিয়া ও আখিরাতে পরকালে নামাযের অনেক উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় উল্লেখ করা হলো:

১। **নামায হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে জান্নাত:** নামায হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘‘আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’’ [৩০]

২। **নামায ঈমানের প্রমাণ ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ :** যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করল তার জন্য নামায জ্যোতি ও প্রমাণ হবে অর্থাৎ নামায তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة»

‘‘যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না। [১৮ঐ] (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

৩। **নামায বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম:** আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[﴿وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب﴾ [العلق: ١٩

‘‘আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।’’[৩১]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করা এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘‘বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো‘আ কর।’’ [৩২]

নামাযের মাধ্যম আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমি আল্লাহর জন্য অবশ্যই বেশি বেশি সাজদাহ্ করবে। কেননা তুমি যখন আল্লাহ্র জন্য একটি সাজদাহ্ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করে দিবেন। [১৬ঐ]

নামাযই হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

৪। **নামায গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফফারা:** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।"[৩৩] কেননা কবীরা গুনাহ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

নামাযে গুনাহ ঝরে যায়

হজরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন; যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় শীতকালে বাইরে (কোথাও) তাশরিফ আনলেন। তখন গাছের পাথা ঝরার মওসুম ছিল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের একটি ডাল হাত দিয়ে ধরলেন। সাথে সাথে তার পাতা আরও বেশি পরিমাণে ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু যর! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত।তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ "মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করে, তখন তার থেকে পাপসমূহ এমনিভাবে ঝরে পড়ে; যেমন ভাবে এ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে।"[১৭ঐ](মুসনাদে আহমদ)

৫। **নামায সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত:**

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةِ لَوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُه لَزَادَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'আবদুল্লাহ (রাঃ)] ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ ('আমাল) আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি বললেন, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী [ইবনু মাস'উদ(রহঃ)] বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এসব উত্তর দিলেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আরও কথা বলতেন। [১৪ ঐ]

৬। **নামাযেরর মাধ্যমে আত্মা প্রশান্ত হয়:** নামাযের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

[﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨

‘‘জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।’’ [৩৪]

আর সম্পূর্ণ নামাযই আল্লাহর যিকির বরং নামায আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤

‘‘আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।’’ [৩ঐ] [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘‘উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।’’ [৩৫] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।’’ [৩৬] পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ [طه:] ١٢٤﴾

‘‘যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।’’ [৩৭]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।

৭। **নামায মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ ভালোভাবে আনজাম দানে সহায়ক:** আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ [البقرة : ٤٥

‘‘তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।’’ [৩৮]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘‘যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।’’[৩৯] সাবেত রহ. বলেন, ‘‘নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।’’ [৪০]

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

''নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?''[৪১]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।'' [৪২]

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। **নামাযে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

''অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।'' [৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥﴾ [الاعلا: ١٤،١٥]

''নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।'' [৪৪] আয়াতে উল্লিখিত ''ফালাহ'' শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। **নামাযের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ﴾ [طه:] ١٣٢

''এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।'' [৪৫]

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, ‘‘অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।’’

১০। **নামায আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা:** নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

‘‘তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।’’[৪৬]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, ‘‘যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও’’। [৪৭]

১১। **নামায ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে:** নামায আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ٢٣﴾ [المعارج: ١٩، ٢٣]

‘‘মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।’’ [৪৮]

১২। **নামায বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক:** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।" [৪৯]

১৩। **সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন হয়:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨

"আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [৫০]
আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত। **[৫১]

৪. গুরুত্বপূর্ণ নামাযের সময় ও ফযীলত

পবিত্র কুরআনুল কারিমের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা সময়গুলো সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন-

فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ حِیۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَ حِیۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ ﴿۱۷

وَ لَہُ الۡحَمۡدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ عَشِیًّا وَّ حِیۡنَ تُظۡہِرُوۡنَ ﴿۱۸﴾

সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাসবিহ আদায় কর, যখন সন্ধ্যায় (মাগরিব ও ইশার নামায দ্বারা) উপনীত হবে এবং সকালে (ফজর নামায দ্বারা) উঠবে। আর অপরাহ্নে (আসর নামায দ্বারা) ও জোহরের সময়ে। আর আসমান ও জমিনে সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই*।' [৫২]

*এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজ পবিত্র সত্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা। যার উদ্দেশ্য হল নিজ বান্দাকে পথ প্রদর্শন যে, উক্ত সময়গুলিতে, যা একের পর এক আসতে থাকে এবং যা আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও মহত্ত্ব বুঝায়, তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করানো। সন্ধ্যা ও সকাল হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলোর প্রারম্ভ। এশা খুব অন্ধকার এবং যোহর খুব উজ্জ্বলতার সময় হয়ে থাকে। অতএব ঐ সত্তা অতি পবিত্র যিনি উক্ত সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি সেই বিভিন্ন সময়ের মধ্যে আলাদা আলাদা উপকারিতা রেখেছেন। অনেকে বলেন, এখানে 'তাসবীহ'র অর্থ হল নামায। উক্ত দুটি আয়াতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা হল, পাঁচ অক্ত নামাযের সময়। تُمسُون (সন্ধ্যা) শব্দে মাগরিব-এশা, تُصبِحُون (ভোর) শব্দে ফজর عَشِيًّا (বিকাল) শব্দে আসর এবং تُظهِرون (দুপুর) শব্দে যোহর নামাযের সময় উল্লেখ হয়েছে। [৫৩]

উক্ত আয়াত দুটি সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার ফযীলত একটি যয়ীফ (দুর্বল) হাদীসে বর্ণনা হয়েছে। আর তা হল এই যে, উক্ত আয়াত দুটি পড়লে দিবা-রাত্রির ছুটে যাওয়া আমল পূরণ হয়ে যায়। [৫৪]

কুরআনে সরাসরি 'পাঁচ' শব্দটি না থাকলেও যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা থেকে দৈনিক 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায' যে মুসলিমদের জন্য ফরজ করা হয়েছে তা স্পষ্ট। রাসূল (সাঃ) নিজে মসজিদে উপস্থিত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করেছেন এবং নামাজের প্রতিটি ধাপ কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে অন্যদেরকেও তা হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই বাস্তব শিক্ষাটি সব কালে এবং বর্তমানেও সেভাবেই পালন করা হচ্ছে। তাই ফরয নামাজের ওয়াক্ত নিয়ে কারো মধ্যেই তেমন কোন দ্বিমত নেই। আর ফরয নামাযের রাকাতের বিষয়টি এতটাই প্র্যাকটিকাল যে, সবকালেই পৃথিবীর সর্বত্র সব মুসলিমই ফজরের ২ রাকাত, জুহুরের ৪ রাকাত, আছরের ৪ রাকাত, মাগরীবের ৩ রাকাত এবং ইশার ৪ রাকাত ফরজ নামাজ নির্দ্বিধায় আদায় করেছেন, এখনও করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। আল-কোরআনে (০৪:১০৩) সুনির্দিষ্ট সময়েই নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে। সেই দিকনির্দেশনা অনুসারে দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ের যে হিসেবে পাওয়া যায় তাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় সূচী স্পষ্টভাবেই বুঝে নেয়া যায়।

৪.১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায(সালাত) কায়েমের নির্দেশ-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوۡكِ الشَّمۡسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيۡلِ وَ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ ؕ اِنَّ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُوۡدًا ﴿۷۸﴾

'' নামায কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার সময় (যোহর ও আসরের নামাজ) থেকে রাত্রির অন্ধকার [ক] পর্যন্ত (মাগরিব ও ইশার নামাজ) এবং প্রত্যুষের কোরআন পাঠ (ফজরের নামাজ); প্রকৃত পক্ষে প্রত্যুষের কোরআন পাঠ তো সাক্ষী-স্বরূপ [খ]।'' [৫৫]

**[ক] دُلُوْكٌ এর অর্থ, ঢলা (সূর্যঢলা) এবং غسق এর অর্থ, অন্ধকার। সূর্য ঢলার পর যোহর ও আসরের নামায এবং রাতের অন্ধকার পর্যন্ত বলতে মাগরেব ও এশার নামায উদ্দেশ্য। আর قرآن الفجر বলতে ফজরের নামায। এখানে কুরআন অর্থ নামায। ফজরের নামাযকে কুরআন বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, ফজরে কিরাআত পাঠ লম্বা হয়। এইভাবে এই আয়াতে পাঁচঅক্ত নামাযের কথা মোটামুটিভাবে এসে যায়। আর এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা হাদীসসমূহে পাওয়া যায় এবং তা বহুধাসূত্রে বর্ণিত উম্মতের পরম্পরাগত আমল দ্বারাও সাব্যস্ত।

[খ] অর্থাৎ, এই সময় ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন; বরং (এ সময়) দিনের ও রাতের ফিরিশতাগণ একত্রে মিলিত হন। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী, সূরা বনী ইস্রাইলের তাফসীর) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাতের ফিরিশতাগণ যখন আল্লাহর নিকট যান, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন -- অথচ তিনি ভালভাবে তা জানেন -- "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?" ফিরিশতাগণ বলেন, 'যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযে রত ছিল এবং যখন আমরা তাদের কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখনও তারা নামাযে রত ছিল।'[৫৬] ** [৫৭] [তাফসিরে আহসানুল বায়ান]

কোন কোন সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করতে হবে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা-

১/ ফজর- আয়াত নং (১৭:৭৮), (১১:১১৪), (৭:২০৫), (৩০:১৭), (৩৮:১৮) ও (৫০:৩৯)

২/ জহুর- আয়াত নং (১৭:৭৮), (৩০:১৮) ও (৫০:৩৯)

৩/ আছর- আয়াত নং (১১:১১৪), (০২:২৩৮), (৩০:১৭) ও (৩৮:১৮)

৪/ মাগরিব- আয়াত নং (১৭:৭৮), (১১:১১৪) ও (০৭:২০৫)

৫/ ইশা- আয়াত নং (১৭:৭৮), (১১:১১৪), (৩০:১৮) ও (৫০:৪০)

৪.১.১. "ফজর নামাযের" নির্দেশ-

''আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে (ফজর) ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না।'' [৫৮]

'' সুতরাং আল্লাহর মহিমা স্মরণ কর সূর্যাস্তের পূর্বে (যখন তোমরা সন্ধ্যায় পৌঁছাও) এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) (যখন তোমরা সকালে পৌঁছাও)।'' [৫৯]

'' আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকালে (ফজর) ও বিকালে তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত;'' [৬০]

''অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং, সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন।'' [৬১]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَى وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا " . ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} .

জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ফাজ্‌র ও আসরের সলাতে তোমরা পরাভূত না হয়ে সামর্থ্যবান হলে তাই করো (সলাত কাযা করো না)। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ): "এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে"-(সূরাহ কাফ ৫০ : ৩৯)। [৬২]

৪.১.২. ফজর নামাযের ফযীলত

অন্যান্য নামায অপেক্ষা ফজর নামাযের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বেশি। যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত দান করবেন। অথাৎ সে আল্লাহর দিদার লাভ করবে, এবং জান্নাতি ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্নিমার রাতের আকাশের চাঁদের মতোই স্পষ্ট দেখবে। (বুখারী)

যে ব্যক্তি নিয়মিত ফজরের নামায আদায় করবে, সে কখোনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা।___(সহিহ মুসলিম ৬৩৪)

ফজরের নামায আদায়কারী, রাসূল (সাঃ)-এর বরকতের দোয়া লাভ করবেন___(সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘বলেছেন,‘মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাযের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামায নেই। এশা ও ফজর নামাযে কী ফযীলত রয়েছে মানুষ যদি তা জানত তবে উক্ত নামাযে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।’’ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ফজর নামাযে নামাযী মুনাফিকের তালিকা থেকে মুক্তিলাভ করে। ফজরের নামায মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যকারী, কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের জন্য ফজর নামায আদায় কষ্টকর___(বুখারী ৬৫৭,৬৪৪,২৪২০,৭২২৪; মুসলিম ৬৬১)

ফজরের সালাত আদায়ের ফলে ব্যক্তির মন ফুরফুরে, প্রফুল্ল হয়ে যায়___(সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম)

ফজর সালাত আদায়ের জাগতিক উপকারের কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে বলেছেন,‘তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়,তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত,অতএব তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়,অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়,অতঃপর সালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য নিয়ে।’ (বুখারী হাদিস নং-১১৪২)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা‘আতে আদায় করল, সে যেন রাত্রির অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকল এবং যে ফজর সালাত জামা‘আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করল।’’ (সহীহ মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, ‘‘ফজরের (সুন্নাত) দু’রাকাত সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম।’’ (সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিজি ৪১৬)

এই ফযীলত তো শুধু ফজরের দু'রাকাত সুন্নাতে তাহলে ফজরের ফরয সালাতের ফযীলত কী হতে পারে? নিশ্চয় সুন্নাতের চেয়ে ফরজের সাওয়াব অনেক বেশি ও উত্তম। এ সমস্ত হাদীস ফজর সালাতের বিরাট প্রতিদান ও গুরুত্বের দলীল।ফজর নামায আদায়কারী আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়

রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো...।' (মুসলিম,হাদিস : ১৩৭৯)।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি ঐ দিন আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব ___(সহিহ মুসলিম, তিরমিজি ২১৮৪)

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।' (মুসলিম, হাদিস : ১৩৭৭)।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করবে, আল্লাহর ফেরেশতাগন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিকে ভালো মানুষ হিসেবে সাক্ষী দিবে।___(বুখারী-মুসলিম)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজর সালাত জামাতের সাথে আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার আমলে দাঁড়িয়ে সারারাত নফল নামাজ আদায়ের সওয়াব দিয়ে দেন!(সহিহ মুসলিম-১০৯৬)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভোরে হেঁটে হেঁটে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার জন্য পরিপূর্ণ আলো দান করবেন।___(আবু দাউদ ৪৯৪)

৪.১.৩. "যোহরের নামাযের" নির্দেশ-

এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, নিশাকালে এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নে (যোহর) থাক। [সূরা আর-রূম (৩০:১৮)]

৪.১.৪. যোহর নামাযের ফযীলত

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরই অনেক উপকারীতা ও ফজিলত রয়েছে। তেমনি যোহর নামাযও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এর ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:

যোহরের সুন্নত নামাজ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,''যে ব্যক্তি নিয়মিত যোহরের পূর্ব ও পরবর্তী চার রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে। দিবেন।'' (তিরমিজী:১/৫৫৩)।

আয়েশা (রা) বলেন, ‘‘নবী করীম (সা) কখনোই জোহরের পূর্বের ও ফজরের পূর্বের সুন্নত নামাজ ছাড়তেন না।’’ (সহীহ বুখারী:১১৮২)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যোহরের সুন্নাত নামাজ আদায় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নবী করীম (সা) বলেছেন, দৈনিক যোহরের নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করেন।

জুমার দিন যোহরের নামাজের পরিবর্তে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়। তাই এ ওয়াক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪.১.৫. "আসর নামাযের" নির্দেশ-

‘’সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের (আসর) ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।‘’ [সূরা আল বাক্বারাহ (০২:২৩৮)]

অধিকন্তু, আল্লাহ সুনির্দিষ্টভাবে মধ্যবর্তী সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা অধিকাংশ সাহাবীগণের মতে আসরের সালাত।

‘’আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকালে ও বিকালে (আসর) তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত;’’ [সূরা ছোয়াদ (মক্কায় অবতীর্ণ)(৩৮:১৮)]

অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন।‘’[সূরা ক্বাফ (৫০:৩৯)]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ " .

নু’মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এ (এশার) নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশী ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয়ার চাঁদঅস্ত গেলে এ নামায আদায় করতেন। [৬৩]

৪.১.৬. আসর নামাযের ফযীলত

ফজর নামাযের মত আসর নামাযেরও বিশেষ মর্ত্যবা রয়েছে-

ফজর আসর নামায আদায়কারীর কিয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার বা সাক্ষাৎ লাভ করবে।

জারির বিন আবদুল্লাহ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বর্ণনা করেন,‘একবার আমরা নবী করিম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন,ওই চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের ও অস্ত যাওয়ার আগের সালাত আদায় করতে পারলে তোমরা তা-ই করো। [৬২ঐ]

এ সালাতের মাধ্যমে সকাল-বিকাল ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়-

ফজর-আসরের সময় ফেরেশতাদের পালাবদল হয়। আর এ সময় বান্দা যা কিছু করে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে তা পেশ করে। এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরে বলেছেন,‘ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন;একদল দিনে,একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন,আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। জবাবে তাঁরা বলেন,আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি,আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজরত ছিলেন।’ (বুখারি, হাদিস)।

এ সালাতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়-

বিখ্যাত তাবেয়ি আবু বকর বিন উমারাহ তাঁর পিতা রুআয়বাহ থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,‘এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে।’ (মুসলিম, হাদিস : ১৩২২)।

৪.১.৭. "মাগরিব নামাযের" নির্দেশ-

‘’আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে (ফজর) ও সন্ধ্যায় (মাগরিব)। আর বে-খবর থেকো না।‘’ [সূরা আল আ’রাফ (০৭:২০৫)]

‘’আর নামায প্রতিষ্টা কর দিনের দুই প্রান্তেই (ফজর ও আছর) এবং রাতের নিকটবর্তী অংশে (মাগরিব ও ইশা); প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।‘’ [সূরা হুদ (১১:১১৪)]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘আপনি অধিকহারে আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন। আর সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪১)

তাফসিরবিদরা বলেন, এই আয়াতে পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজ আদায় করা। এই আয়াতে ফজর ও মাগরিবের নামাজের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ এ দুই সময়ে প্রকৃতিতে বড় দুটো পরিবর্তন হয়। দিন ও রাতের পালাবদল ঘটে।

সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, 'সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নবী (সা.)-এর ইমামতিতে মাগরিবের নামাজ আদায় করতাম।' (বুখারি, হাদিস : ৫৬১)

৪.১.৮. মাগরিবের নামাযের ফযীলত

মাগরিবের নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অন্যতম। সন্ধ্যায় সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেলে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর পশ্চিম আকাশে দিগন্তলালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পড়া যায়। তবে সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব।

হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে, যতদিন তারা মাগরিবের নামাজ আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব না করবে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪১৮) অর্থাৎ যথাসম্ভব সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, বিলম্ব করা অনুচিত।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তায়ালা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারির উপকরণ প্রস্তুত করেন।' (বুখারি, হাদিস : ৬২২)

বর্ণিত আয়াত ও হাদিস থেকে সকাল-সন্ধ্যার ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। এমনকি উল্লিখিত হাদিস থেকে এ-ও বোঝা যায়, মাগরিবের নামাজ অতি বরকতময়।

মাগরিবের ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজের কথা হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি এর ফজিলতও অপরিসীম। যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। (তিরমিজি, হাদিস : ৬৩৬২)

৪.১.৯. "এশার নামাযের" নির্দেশ-

''এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, নিশাকালে (এশা) এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নে (যোহর) থাক।'' [সূরা আর-রূম (৩০:১৮)]

''রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশচাতেও।'' [সূরা ক্বাফ(৫০:৪০)]

'' আর নামায প্রতিষ্ঠা কর দিনের দুই প্রান্তেই (ফজর ও আসর) এবং রাতের নিকটবর্তী অংশে (মাগরিব ও এশা); প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।'' [সূরা হুদ (১১:১১৪)]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ " .

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এ (এশার) নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশী ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয়ার চাঁদঅস্ত গেলে এ নামায আদায় করতেন। [৬৪]

৪.১.১০. এশার নামাযের ফযীলত

এশার সালাতের মাধ্যমে অর্ধ রজনী ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন রাত্রির অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকল'' (সহীহ মুসলিম, হাদিস : ১৩৭৭)

অন্য বর্ননায় এসেছে ''''যে ব্যক্তি এশার সালাত ও ফজর সালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করল।'' (সহীহ মুসলিম হাদিসঃ ৬৫৬)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''বলেছেন,'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এশা ও ফজর সালাতে কী ফযীলত রয়েছে মানুষ যদি তা জানত তবে উক্ত সালাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।'' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৪.২. জুমার নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

জুমার নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ নামায। সপ্তাহের শুক্রবার এই নামাজের বিধান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য দিয়েছেন। শুক্রবার সকাল থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদ-এলাকার সবাই একসঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করে। এটা মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক মিলনমেলা। অন্যান্য কাজ-কর্ম সাময়িক বন্ধ রেখে এই মিলনমেলায় উপস্থিত হয়ে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য আল্লাহ তাআলা কঠিন আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন (জুমার) নামাযের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝো। (সুরা জুমুআ, আয়াত :০৯)

একদিকে আল্লাহ তাআলা জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়ার কঠিন নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যদিকে জুমার নামাজ আদায় করার বিপুল ফযিলত রেখেছেন। যে যতো আগে আসবে, সে ততোবেশি লাভবান হবে।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'শুক্রবার দিন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা অবস্থান করে এবং (জুমার নামাজের) আগমনকারীদের নাম ক্রমানূসারে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। অতঃপর ইমাম যখন (মিম্বরে) বসেন, তারা লেখাগুলো গুটিয়ে নেয় এবং যিক্র (খুতবা) শোনার জন্য চলে আসে। মসজিদে যে আগে আসে, তার উদাহরণ সে ব্যাক্তির মত যে একটি উটনী কোরবানি করেছে। তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি গাভী কোরবানি করেছে। তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি ভেড়া কোরবানি করেছে এবং তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি মুরগি দান করেছে। পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি ডিম দান করেছে। ' (মুসলিম, হাদিস নং: ২০২১)

শুধু তাই নয়, জুমার নামাজ জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হলে, প্রতি কদমে এক বছর নফল রোযা ও নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যায় এবং জুমার নামাজ আদায় করলে দশ দিনের গোনাহ মাফ হয়।

রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিনে সকাল সকাল গোসল করল এবং গোসল করাল, তারপর ইমামের কাছে গিয়ে বসে চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনল, প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে সে এক বছরের রোজা ও নামাজের সওয়াব পাবে। ' (তিরমিজি, হাদিস নং : ৪৯৮)

আল্লাহর রাসুল (সা.) আরও বলেন, 'জুমার দিনে যে ব্যক্তি গোসল করে জুমার নামাজের জন্য যায় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী নামাজ আদায় করে, এরপর ইমাম খুতবা শেষ করা পর্যন্ত নীরব থাকে। এরপর ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায় করে। তবে তার এ জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। ' (মুসলিম, হাদিস নং : ২০২৪)

বস্তুত জুমার নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময়। আমরা অনেকেই জুমার নামাজকে অবহেলা করে থাকি। অযথা ও বিনা কারণে কখনও জুমার নামাজ পরিত্যাগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরিয়তে কঠিন সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিন জুমা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলা তার হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। ' (তিরমিজি হাদিস নং : ৫০২)

৫ ওয়াক্ত ফরয এবং জুমার ফরজ ছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নামায আছে যেমন দুই ঈদের নামায, তারাবী নামায, বিতরের নামায; যেগুলোর গুরুত্ব ও ফযীলত কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

৪.৩. দৈনিক গুরুত্বপূর্ণ নফল নামায সমূহের গুরুত্ব ও ফযীলত

মুসলমান হিসেবে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়তে হয়। কিন্তু এমন কিছু নফল নামাজ আছে, যা পড়লে উভয় জাহানে ব্যাপক কল্যাণ সাধন হয়, হাদিসে কুদসিতে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন: আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়া'লা বলেন- 'আমার বান্দা নফলের মাধ্যআমার কাছাকাছি হয়। এক পর্যায়ে সে আমার প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে যায়।'। এসব নফল নামাজ পাঁচ ওয়াক্তে পড়তে হয়। এগুলো হচ্ছে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, জাওয়াল ও আউওয়াবিন।

৪.৩.১. তাহাজ্জুদ

শেষ রাতে মানুষ যখন গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে, তখন তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসায় নিদ্রা ত্যাগ করে জেগে ওঠে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। ' (সূরা: সাজদা, আয়াত: ১৬)।

শুধু নামাজ আদায় নয়, রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা খাঁটি ঈমানদারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঈমানদারদের গুণাবলি সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, 'তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত ব্যয়কারী ও রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থী। ' (সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭)।
রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অধিক নামায আদায় করতেন। কেননা এই সময়টি ছিল তাঁর ও তাঁর প্রতিপালকের একান্ত মুহুর্ত। এ কারণে তিনি রাতের নামাজ সম্পর্কে বলেন,
«أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل
'' ফরয নামায গুলোর পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হলো রাতের নামায ''। [সুনানে আবু দাউদ: ২৪২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৪৮৮]

তাহাজ্জুদ নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর শ্রেষ্ঠ নামাজ। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের তাহাজ্জুদের নামাজ। ' (মুসলিম, হাদিস নম্বর : ১১৬৩)।

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব! কে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে দান করব! আর কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব!' (বুখারি ও মুসলিম)।

প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িসহ সব যুগের ওলি ও বিদ্বানরা তাহাজ্জুদ নামাজে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন।

হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেন। প্রিয় নবীর (সা.) প্রতি কিছু সময় নামাজ পড়ার নির্দেশ ছিল না বরং রাতের কিছু অংশ ছাড়া সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশ ছিল।

আরবি 'তাহাজ্জুদ' শব্দের অর্থ হলো নিশীথে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া। রাতের দ্বিতীয় প্রহরের পর ঘুম থেকে জেগে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে নামাজ আদায় করা হয়, তা-ই তাহাজ্জুদ নামাজ। ফকিহগণ বলেন, এশার নামাজ শেষে ঘুমানোর পর আবার জেগে এই নামাজ পড়তে হয়। কেউ কেউ 'জুহদ' শব্দের সঙ্গে 'তাহাজ্জুদ'-এর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে মনে করেন; যার অর্থ হলো শক্তি ও ক্লেশ। কারণ, এই নামাজে কষ্ট-ক্লেশ হয় এবং এর জন্য মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয় বা এর দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয়। মধ্যরাতের পরে বা রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে তাহাজ্জুদ নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। ঘড়ির ঘন্টা হিসেবে রাত দুইটার পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার (সূর্যোদয়ের দেড় ঘন্টা) আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত। সালাতুল লাইল বা তাহাজ্জুদ এশার নামাজ আদায়ের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত পড়া যায়। তবে অর্ধ রাতের পর থেকে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া ভালো। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা সর্বোত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ রাকাআত তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাই ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়াই ভালো। তবে এটা পড়া আবশ্যক নয়। সম্ভব হলে ১২ রাকাআত তাহাজ্জুদ আদায় করা। তবে ৮ রাকাআত আদায় করা উত্তম। সম্ভব না হলে ৪ রাকাত আদায় করা। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে ২ রাকাত হলেও তাহাজ্জুদ আদায় করা ভালো। তবে তাহাজ্জুদ নামাজের কোনো কাজা নেই।

মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জামানায় তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য আলাদা আজান দেওয়া হতো। এখনো মক্কা ও মদিনা শরিফে এ নিয়ম প্রচলিত আছে। নবীজি (সা.) সব সময় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব (সা.)কে উদ্দেশ করে বলেন, 'এবং রাত্রির কিছু অংশ তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমুদে)।' (১৭: ৭৯)। তাহাজ্জুদ নামাজ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য ছিল। এর রাকাত সংখ্যা ৮, ১২ থেকে ২০ পর্যন্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। চার রাকাত বা দুই রাকাত পড়লেও তা তাহাজ্জুদ হিসেবে পরিগণিত হবে। এই নামাজকে 'সালাতুল লাইল' বা 'কিয়ামুল লাইল'ও বলা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত নফলের মধ্যে তাহাজ্জুদ সর্বোৎকৃষ্ট আমল। এ সময় আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দার ফরিয়াদ শোনেন।

৪.৩.২. ইশরাক

'ইশরাক' অর্থ হলো উদয় হওয়া বা আলোকিত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় ইশরাক হলো সূর্যোদয়ের পর যখন পূর্ণ কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, সে সময়। এই সময়ের নামাজকে ইশরাক নামাজ বলা হয়।

হযরত আনাস রাযি থেকে বর্ণিত,

عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة.(هذا حديث حسن غريب

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায পড়বে,অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকবে,তারপর দু'রাকাত নামায পড়বে,তাহলে সে একটি হজ্ব ও একটি উমরার সওয়াব পাবে।এরপর তিনি তাকিদ করে বলেন,হ্যা পূর্ণ হজ্ব ও উমরার সওয়াব সে পাবে। [৬৫]

ইমাম তিরমিযি রাহ উক্ত হাদীসকে হাসান বলেছেন। তাছাড়া হযরত জবির রাযি থেকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর দৈনন্দিন আদত বা অভ্যাস বর্ণিত রয়েছে,

عن جابر بن سمرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس

هذا حديث حسن صحيح

রাসূলুল্লাহ সাঃ ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযেই বসে থাকতেন। [৬৬] অর্থাৎ ইশরাকের জন্যই বসে থাকতেন৷

এই হাদীস সমূহ দ্বারা ইশরাকের নামাযই উদ্দেশ্য। কেননা সূর্যোদয়ের দিনের প্রথমভাগে যে নামায পরা হয় সেটার নাম ইশরাক।

‘রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন; এরপর সূর্য ওপরে উঠলে তিনি (ইশরাকের) নামায আদায় করতেন।’ (আবু দাউদ: ১২৯৪)।

এ নফল নামাজের ফযীলত বর্ণনায় একাধিক হাদিসে এসেছে-

হজরত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক নামাজের পর (ধারাবাহিক) আর এক নামাজ; যার মাঝখানে কোনো গোনাহ হয়নি, তা ইল্লিয়্যুন (উচ্চ মর্যাদায়) লেখা হয়।’ (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘যে ব্যক্তি জামাআতের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ল। অতপর সূর্য উঠা পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর জিকির করল; অতপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাআত নামাজ পড়ল; সে একটি হজ ও ওমরাহ করার সাওয়াব নিয়ে ফিরে গেল।’ (তাবারানি)

মুফতি আমিমুল ইহসান (রা.)-এর মতে, সাধারণত সূর্যোদয়ের ২৩ মিনিট পর ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু হয়। কারও মতে, সূর্যোদয়ের ২৫ বা ৩০ মিনিট পর থেকে এর সময় আরম্ভ হয়। শায়খ ইসাইমিনের মতে, সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর ইশরাক

আরম্ভ হয়। আধুনিক গবেষণায় সূর্যোদয়ের পাঁচ থেকে আট মিনিট পরই ইশরাকের সময় হয়। সকাল নয়টা পর্যন্ত এই নামাজ আদায় করা যায়। মোটকথা সূর্যোদয়ের পর মাকরুহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর যেকেনো মূহুর্তে ইশরাকের নামায পড়া যাবে। ইশরাকের নামাজের জন্য সুস্পষ্ট আলাদা কোনো সূরাহ ক্বিরাত নেই।

ইশরাকের নামায রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে দু'রাকাত প্রমাণিত রয়েছে। এবং হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি থেকেও দু রা'কাতের এক বর্ণনা রয়েছে। তবে অন্য এক বর্ণনায় চার রা'কাতের কথাও এসেছে। যেমন হযরত আবু-দারদা এবং হযরত আবু যর রাযি থেকে বর্ণিত,

عن أبي الدرداء، وأبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره.

هذا حديث حسن غريب.

হে বনী আদম! আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রা'কাতের গুরুত্ব দাও, আমি দিনের শেষাংশ পর্যন্ত তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবো। [৬৭]

৪.৩.৩. চাশত

'চাশত' অর্থ হলো দিনের দ্বিতীয় প্রহর, মধ্যাহ্ন–পূর্ব বা মধ্য–পূর্বাহ্ন। চাশত শব্দটি ফারসি, এর আরবি প্রতিশব্দ হলো দোহা বা জোহা; উচ্চারণে এটি দুহা বা জুহা হয়ে থাকে। কোরআনে এই (দোহা বা জোহা) নামে একটি সূরাও রয়েছে। যার শুরুতে বলা হয়েছে: শপথ পূর্বাহ্নের! (৯৩:১)। এই সময়কে ওয়াক্তুজ জুহা বা চাশতের ওয়াক্ত বলা হয়। চাশত নামাজ ৮ থেকে ১২ রাকাত পড়া ভালো; তবে চার রাকাত বা দুই রাকাত পড়লেও চাশত নামাজ বলেই গণ্য হবে।

মূলত চাশত, দুহা/যুহা একই নামাযের ভিন্ন নাম। অন্যান্য ফরয নামাযের পরে নফল নামায পড়ার জন্য সময় সীমিত থাকে। ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়। এই সময় বান্দা যাতে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না হতে পারে তাই এই নফল নামাযের ভূমিকা অনেক মর্ত্যবার অবকাশ রাখে।

ফরয নামাযের মত নির্দিষ্ট করে নফল নামাযের শুরু এবং শেষ সীমানাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ননা করেননি।

তবে হযরত আলী রাযি থেকে এর সময় সীমা বর্ণিত রয়েছে,তিনি বলেন,

عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذاك، فقلنا: من أطاق ذاك منا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى

أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين

পূর্বদিগন্তে সূর্য যখন এ পরিমাণ উদয় হয়েছিলো, যতটুকু পশ্চিম দিগন্তে আসরের সময় থাকে, তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ দুই রাকাত নামায পড়তেন।এবং পূর্বদিগন্তে সূর্য যখন এ পরিমাণ উদয় হয়েছিলো,যতটুকু পশ্চিম দিগন্তে যোহরের সময় থাকে,তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ চার রাকাত নামায পড়তেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাঃ যোহরের ফরযের পূর্বে চার রা'কাত ও পরে দু'রাকাত এবং আছরের পূর্বে চার রা'কাত সুন্নত পড়তেন।প্রত্যেক দু'রাকাতের পর ফিরিস্তার, আম্বিয়া,এবং পরবর্তী উম্মতের উপর সালাম তথা তাশাহুদ পড়তেন। [৬৮]

এখানে প্রথম নামায দ্বারা ইশরাকের নামায উদ্দেশ্য আর দ্বিতীয় নামায দ্বারা চাশতের নামায উদ্দেশ্য।

ইমাম গাযযালী রাহ,বলেন,ইশরাকের নামায ঐ সময় পড়া হবে,যখন সূর্য এক নে'যা পরিমাণ উচুতে উঠবে।আর দিনের এক চতুর্থাংশ চলে যাবার পর চাশতের নামায পড়া হবে।(এহইয়াউল উলূম-১/১৯৭)

সূর্যোদয় এবং যাওয়ালের ঠিক মধ্যবর্তী সময়-ই চাশতের নামাযের জন্য উত্তম।

সালাতুদ-দোহা/ চাশতের নামাযের ফযিলতঃ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি থেকে বর্ণিত,

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة.

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,যে ব্যক্তি চাশতের ১২রা'কাত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি প্রসাদ নির্মাণ করে দেবেন। [৬৯]

সালাতুদ-দোহা/চাশতের নামাযের সময়ঃ

চাশতের নামায যা ফুকাহায়ে কেরামদের নিকট সালাতুয-যুহা নামে পরিচিত, এ নামাযের সময়সূচী সম্পর্কে দুররুল মুখতারে বর্ণিত আছে,

نُدِبَ (أَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضُّحَى) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إلَى الزَّوَالِ وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بَعْدَ رُبُعِ النَّهَارِ وَفِي الْمُنْيَةِ: أَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا اثْنَيْ عَشَرَ، وَأَوْسَطُهَا ثَمَانٍ

ভাবার্থঃ বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী চার রাকাত বা তার চেয়ে বেশী সালাতুয-যুহা (চাশতের নামায)পড়া মুস্তাহাব।সূর্যোদয়ের পর থেকে নিয়ে যাওয়ালে সূর্য বা মাথার উপর থেকে সূর্য পশ্চিমদিকে হেলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়ে ভিতর। উত্তম হচ্ছে দিনের এক চতুর্থাংশ চলে যাবার পর পড়া। মুনয়া কিতাবে বর্ণিত আছে-

সর্বনিম্ন ২রাকাত ও সর্বোচ্ছ ১২ রাকাত এবং মধ্যম হচ্ছে ৮ রাকাত। দুররুল মুখতার-২/২২

২থেকে ১২ রাকাত যে কোনোটা পড়া যাবে। ফাতাওয়া রহিমিয়্যাহ-৪/৮৩। কিতাবুল-ফাতাওয়া-২/৩৬৩

সালাতুদ-দোহা/চাশতের নামাযের রা'কাত সংখ্যাঃ

হযরত উম্মে হানি রাযি থেকে বর্ণিত,

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل، فسبح ثمان ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود

রাসূলুল্লাহ সাঃ মক্কা বিজয়ের দিন উনার ঘরে প্রবেশ করেন,অতঃপর গোসল করেন,তারপর আট রাকাত চাশতের নামায পড়েন।আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে এত তারাতারি নামায পড়তে কখনো দেখিনি।তবে রুকু সেজদা ভালোভাবে করেছেন। [৭০]

তবে সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাঃ সর্বদা চার রাকাতই চাশতের নামায পড়তেন। যেমন হযরত আয়েশা রাযি থেকে বর্ণিত রয়েছে,

عن معاذة، أنها سألت عائشة رضي الله عنها، كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: «أربع ركعات ويزيد ما شاء.»

হযরত আয়েশা রাযি কে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর চাশতের নামাযের সংখ্যা নিয়ে জিজ্ঞাসা হলে তিনি জবাবে বলেন,রাসূলুল্লাহ সাধারণত চার রা'কাত চাশতের নামায পড়তেন।তবে কখনো কখনো এর চেয়েও বেশী পড়তেন। [৭১]

৪.৩.৪. জাওয়াল

'জাওয়াল' অর্থ হলো স্থানান্তর, স্থানচ্যুতি, পরিবর্তন, আবর্তন, সরে যাওয়া ও হেলে যাওয়া ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় জাওয়াল হলো দিনের তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভ, মধ্যাহ্নোত্তর, অপরাহ্ণের সূচনা সময়; দিনের মধ্যভাগে বা দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যায়। এই সময়কে ওয়াক্তুজ জাওয়াল বলা হয়। এটি মূলত মধ্যদিনের সিজদা ও নামাজ নিষিদ্ধ সময়ের পর জোহরের ওয়াক্তের সূচনাপর্ব। এ সময় যে নফল নামাজ আদায় করা হয়, তাকে জাওয়ালের নামাজ বলা হয়।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) সর্বদা সূর্য ঢলে পড়ার পর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আপনি সদা সূর্য হেলে পড়লে চার রাকাত নামাজ কেন আদায় করেন? তিনি (সা.) বললেন, সূর্য ঢলে পড়লে আসমানের দরজা খোলা হয়, এরপর জোহর নামাজ পর্যন্ত তা বন্ধ করা হয় না। আমি চাই, ওই সময়ে আমার কোনো নেক আমল ওপরে যাক। (ইবনু মাজাহ: ১১৫৭)। জাওয়াল নামাজ চার রাকাত, দুই রাকাত পড়লেও তা নামাজরূপে পরিগণিত হয়।

৪.৩.৫. আউওয়াবিন

'আউওয়াবিন' আরবি শব্দ। এটি বহুবচন; অর্থ হলো প্রত্যাবর্তনকারীরা। কর্মবাচ্য বা কর্মকারক ও সম্বন্ধ পদ হিসেবে হয় 'আউওয়াবিন', কর্তাবাচক ও কর্তৃকারক হিসেবে মূল রূপ হলো 'আউওয়াবুন'। এর একবচন হলো আউওয়াব, যার মানে হলো প্রত্যাবর্তনকারী। যিনি আল্লাহর দিকে বেশি বেশি ফিরে আসেন, গুনাহ থেকে বেশি পরিমাণে তওবা করেন। 'আউওয়াব' শব্দটি পবিত্র কোরআনে চারবার এসেছে। 'আউওয়াব' শব্দের আরেকটি অর্থ হলো 'অত্যধিক অনুগত', যিনি একান্তে গোপনে নির্জনে নিজের পাপ স্মরণ করে তার জন্য তওবা করে আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে যান। 'আউওয়াব' শব্দটি 'মুসাব্বিহ' বা তাসবিহ পাঠকারী তথা পবিত্রতা বর্ণনাকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কখনো এটি 'দৃঢ় সংকল্প' ও 'অবিচল' অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার 'সন্ধ্যা সমীরণ' অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে। আরবদের মধ্যে 'আবাতিশ শামস' কথাটি 'গাবাতিশ শামস' অর্থে ব্যবহৃত হয়; 'গারাবাতিশ শামস' মানে সূর্য অস্তমিত হলো বা সূর্য অস্ত গেল।

শরিয়তের পরিভাষায় 'আউওয়াবিন নামাজ' হলো মাগরিবের নামাজর পর এশার নামাজের আগে আদায় করা নামাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকাত নামাজ আদায় করবে; এসবের মাঝে কোনো মন্দ কথা না বলে, তার এই নামাজ ১২ বছরের ইবাদতের সমতুল্য গণ্য হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ২০ রাকাত নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। (তিরমিজি, মিশকাত; ১০৩-১০৪; ফয়জুল কালাম, পৃষ্ঠা: ৩২০-৩২১, হাদিস: ৪৪৯-৪৫০)।

'রাসুলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়তেন এবং তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়বে, তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে; যদি তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণও হয়।' হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই নামাজকে আউওয়াবিন নামে অভিহিত করেছেন। ইমাম তীবি (রা.)-এর মতে, মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতও এই ছয় রাকাতের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট রাকাতগুলো এক নিয়তে দুই বা চার রাকাত করে পড়া যায়। কিছু ওলামায়ে কেরামের মতে ফরজের পরই আওয়াবিনের সময় শুরু হয়। অতএব, দুই রাকাত সুন্নতসহ সর্বমোট ছয় রাকাত পড়ার দ্বারা আওয়াবিন পড়ার সওয়াব অবশ্যই পেয়ে যাবে। তবে দুই রাকাত সুন্নত পড়ার পর ছয় রাকাত আওয়াবিন পড়াই শ্রেয়। আওয়াবিন নামাজে পড়ার বিশেষ কোনো সুরা নেই। (মাজমাউল আনহুর : ১/১৯৫, তিরমিজি, হাদিস : ৪৩৫, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ৩/১৫৫)।

নবীজি (সা.) কখনো ৬ রাকাত (তিরমিজি) কখনো ৪ রাকাত (নাইলুল আওতার) কখনো ১২ রাকাত (ইতহাফুস সাদাহ : ৩/৩৭১) আবার কখনো বা ২০ রাকাত (তিরমিজি : ৪৩৫) নফল নামাজ পড়তেন। তবে ৬ রাকাতই অধিকাংশ সময় পড়তেন। অউয়াবিন নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন নামাজি মাগরিবের নামাজ পড়ে শেষ করে এবং এর ওয়াক্ত ইশার ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত থাকে।' (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)। অর্থাৎ মাগরিবের পর সর্বোচ্চ ২০ রাকাত ও সর্বনিম্ন দুই রাকাত পড়ার কথা বর্ণিত আছে; চার রাকাত এবং ছয় রাকাতের বর্ণনাও পাওয়া যায়। যার পক্ষে যখন যা সম্ভব, তিনি তা-ই পড়বেন।

৫. নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়ের গুরুত্ব

সালাত (নামায) দিনে ৫ (পাঁচ) ওয়াক্তে (সময়ে) ৫(পাঁচ) বার ফরযে আ'ঈন (অবশ্যই পালনীয়)

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ◯

"উল্লিখিত সময় সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" [৭২]

ইবন কাসীর রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন: "ইবন আব্বাস "মাওকূতান" এর তাফসীরে ফরয অর্থ নিয়েছেন"। তিনি আরো উল্লেখ করেন: "হজের মতো সালাতেরও সময় নির্ধারিত"। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন: "ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হজের মতো সালাতেরও একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে"।

এ সম্পর্কে আল-বুখারী (রহ.) বলেন : "উল্লিখিত সময় হলো নির্ধারিত (সময়)। তিনি সালাতের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।"

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةِ لَوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُه لَزَادَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

['আবদুল্লাহ (রাঃ)] ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ ('আমাল) আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি বললেন, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী [ইবনু মাস'উদ(রহঃ)] বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এসব উত্তর দিলেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আরও কথা বলতেন।[১৪ঐ] সহীহ : বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৮৫, নাসায়ী ৬১০, আহমাদ ৩৮৯০, ইরওয়া ১১৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৯৭।

এই হাদীসে রাসূল (সা) সুস্পষ্ট করেছেন যে, নির্ধারিত সময়কে সালাত আদায় করা আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় 'আমল। এই 'আমলটিকে তিনি (সা) বাবা-মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এর প্রমাণ হলো হাদীসে 'তারপর কী?' ক্রমবাচক পদবাচ্যের ব্যবহার। এই শব্দগুচ্ছটি গুরুত্বের ক্রম বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং আরবি ভাষাভাষীদের কাছে বিষয়টি সুপরিচিত।

আল-হাফিয ইবনু হাজার তার 'আল-ফাত্‌হ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "ইবনু বাযীযা বলেছেন : এক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় তা হলো, সকল দৈহিক প্রচেষ্টার মধ্য থেকে জিহাদকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া, কারণ এতে আত্মত্যাগের বিষয়টি জড়িত। তবে

ধৈর্য ধারনের বিষয়টি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ ফরজ সালাতগুলোকে রক্ষা করা, সেগুলোকে সঠিক সময়ে আদায় করা এবং নিজের মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ করার বিষয়টি ধৈর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যা একটি সার্বক্ষণিক বিষয়। সত্যবাদীরা (সদীকূন) ব্যতীত অন্যকেউ আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিকভাবে ধৈর্যশীল থাকতে পারে না। ধৈর্য ধারনের বিষয়টি নাফ্‌সের (কুপ্রবৃত্তির) বিরুদ্ধে জিহাদ। তাই নির্ধারিত সময়ে সালাত পড়া ধৈর্যশিল মুত্তাকী বান্দার কাজ। আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।”

সাহাবীগণের যুগের তাফসীরের ইমামদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কীভাবে হজের মতো সালাতেরও এক নির্ধারিত সময় সাব্যস্ত করেছেন। আর কে আছে এমন যে হজ নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে তা অসময়ে আদায় করবে? সালাতেরও সময় এমনি নির্ধারিত, কোনো শর‘ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় না করলে আল্লাহ কবুল করবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: “যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, দলীল-প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে না, বরং কারূন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালাফের সাথে তার হাশর (পুনরুত্থান) হবে”। [১৮ঐ](মুসনাদে আহমদ)

আর যে ব্যক্তি সালাত ঠিক সময়ে আদায় করল না, সে সালাতের হিফাযতও করল না। তার পরিণতি কারূণ, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালাফের মত বড় বড় কাফেরের মত হবে।

মূসা ইবনু ইসমা‘ঈল বলেন : আনাস থেকে গাইলান থেকে মাহ্‌দি বর্ণনা করেন যে : “একবার আনাস (রা) অনুপাত এবং আক্ষেপ করে বললেন, নবীর (সা) সময়ে যে সমস্ত (‘আমল) দেখেছিলাম এখন তার একটিও দেখতে পাই না। এক ব্যক্তি বললেন, সালাত এখন বাকি আছে। আনাস (রা) বললেন, দেখো না! কীভাবে সালাতকে বিনষ্ট করেছ?” [৭৩]

এখানে তিনি মূলত সালাতের নির্ধারিত সময় পার করে দিয়ে অসময়ে সালাত আদায়ের বিষয়ে কথা বলছেন। আব্দুল ‘আযীযের ভাই, উসমান ইবনু আবি রাউওয়াদ বলেন: “আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি : একবার দামেস্কে আনাস ইবনু মালিকের কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি কাঁদছেন। তাই জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি কিছুক্ষন থেমে বললেন : হায়! যা কিছু দেখেছিলাম এখন তার কিছুই দেখছি না। এমনকি এই সালাতকেও নষ্ট করা হচ্ছে।” [৭৪]

‘ফাতহুল বারী -তে ইবনু হাজার (রহ.) বলেছেন : আল-মুহাল্লিব বলেছেন : ‘নষ্ট করা হচ্ছে’ এর অর্থ হলো উত্তম এবং নির্দেশিত সময় থেকে বিলম্ব করা। এর অর্থ এই নয় যে, তারা ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর সালাত আদায় করতেন।’ ইবনু হাজার এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন, এর অর্থ হলো মূলত ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর সালাত আদায় করা। আনাস (রা) এই ব্যাপারে কান্নাকাটি করতেন আর আমরা কী করছি? আমাদের ক্ষেত্রে কী করা বাঞ্ছনীয়? সালাতের প্রতি অবহেলার জন্য এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য আমাদের কি চোখের জলে নদী হয়ে যাওয়া উচিত নয়?

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَه عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَه وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَه عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَه. رَوَاهُ أَحْمَد وأَبُوْ دَاوُدَ وروى مالك وَالنَّسَائِيّ نحوه

‘উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, যা আল্লাহ তা’আলা (বান্দার জন্য) ফারয্ করেছেন। যে ব্যক্তি এ সলাতের জন্য ভালভাবে উযূ করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকূ’ ও খুশুকে

পরিপূর্ণরূপে করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া’দা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া’দা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। [iHadis.com-৫৮৩] মালিক এবং নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৭৫]

কা‘ব ইবনু উজ্‌রা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমাদের কাছে এলেন এবং আমরা ছিলাম ৭ জনের একটি দল। আমাদের চারজন ছিল মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আর বাকিরা আগে কখনো গোলাম ছিল না। আমরা মসজিদের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম এবং তিনি (সা) বললেন : “তোমরা বসে আছো কেন?” আমরা বললাম : আমরা সালাতের জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি (কা‘ব) বললেন : তখন তিনি (সা) কিছুক্ষন চুপ করে থাকলেন এবং আমাদের দিকে ফিরে বললেন : “তোমাদের রব কী বলেছেন তা কি তোমরা জানো?” আমরা বললাম : “না।” তিনি (সা) বললেন: “নিশ্চয়ই তোমাদের রব বলেছেন : যে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে, ধারাবাহিকভাবে সালাতের হেফাজত করে এবং এর সত্যিকার গুরুত্বকে নগণ্য ভেবে একে বিনষ্ট না করে, তার সাথে আমার অঙ্গীকার হলো আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে না, ধারাবাহিকভাবে সালাতের হেফাজত করে না এবং এর সত্যিকার গুরুত্বকে নগণ্য ভেবে একে বিনষ্ট করে, তার সাথে আমার কোনো অঙ্গীকার নেই। আমি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেবো আর চাইলে তাকে শাস্তি দিবো।” [৭৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রা) বলেন : একদিন নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : “তোমরা কি জানো, তোমাদের রব (সুবহানাহু ওয়া ত‘আলা), কী বলেছেন?” আমরা বললাম : আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল (সা) ভালো জানেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) একথা তিনবার বলেন। অতঃপর বললেন: “আমার ক্ষমতা ও মহত্ত্বের কসম! যথা সময়ে সালাত আদায়কারী প্রত্যেককে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে নির্ধারিত সময়ের বাইরে অন্য কোনো সময় সালাত আদায় করবে, আমি তার প্রতি দয়াও করতে পারি আবার তাকে শাস্তিও দিতে পারি।”[৭৭] **[৭৮]

৫.১. সময়মত নামায আদায় না কারার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়া’লার সতর্কবার্তা:

[﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون: ٤، ٥

“সুতরাং দুর্ভোগ (‘ওয়াইল’ জাহান্নামের একটি স্থান) সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।” [৭৯]

তাফসীরকারকগণ এই আয়াতের তাফসীর করেন যে, এই আয়াত দ্বারা ঐ সমস্ত লোক বুঝায়, যারা সালাতকে তার সময় থেকে পিছিয়ে অসময়ে আদায় করে। সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন “এরা ঐ সমস্ত মানুষ যারা সালাতকে তার (প্রকৃত) সময়ে আদায় না করে পরে আদায় করে”। **[৮০] (তাফসীর ইবন কাসীর)

আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মুসল্লী (সালাত আদায়কারী) নামে অভিহিত করা সত্বেও তাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন। কেননা তারা সালাত প্রকৃত সময়ের পরে আদায় করে। অতএব, সালাতকে আপন ওয়াক্ত থেকে পরে আদায় করার জন্য আল্লাহ যাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন।

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যারা সালাত (নামায) সম্পর্কে উদাসীন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তা হচ্ছে শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করা। তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়াইল নামক কঠিন শাস্তির স্থান। কেউ বলেন, "ওয়াইল" হচ্ছে জাহান্নামের একটি

নিম্নভূমি। দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতসমূহ তার (ওয়াইলের) মধ্যে রাখা হলে তার কঠিন উত্তাপে তা গলে যাবে। অথচ এ স্থানটি বিলম্বে ও উদাসীন সালাত (নামায) আদায়কারীদের পরকালীন জগতের ঘরবাড়ী অর্থাৎ আবাসস্থল। [৮১] সুতরাং সালাতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ওয়াক্ত। শর'ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত ওয়াক্ত নষ্ট করা যাবে না। অতএব, সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

৫.২. নিজের খেয়াল খুশিমতো নামায আদায়কারী ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন-

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ ৫৯-

অত:পর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।[৮২]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ সম্পূর্ণরূপে সালাত (নামায) পরিত্যাগ করা নয়, বরং তার অর্থ: একেবারে শেষ ওয়াক্তে সালাত (নামায) আদায় করা। ইমামুত্ তাবিঈন সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা সালাত (নামায) নষ্ট করলো-এর অর্থ হচ্ছে, আসরের ওয়াক্ত অত্যাসন্ন হওয়ার সময় যোহর ওয়াক্তের নামায আদায় করা, মাগরিবের ওয়াক্তের সাথে মিলিয়ে আসর নামায পড়া, ইশার ওয়াক্তের সাথে সংযুক্ত করে মাগরিব ওয়াক্তের ফৌত হয়ে (যাকে কাজা বলা হয়) যাওয়া নামায আদায় করা, ইশার সালাত (নামায) ফজর ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা এবং সূর্যোদয়ের সময় ফজর ওয়াক্তের নামায আদায় করা।**[৮৩]

সঠিক সময়ে নামায আদায়ের সাথে সাথে নামাযের নিয়ম-কানূন শিখার প্রতিও তেমনি তৎপর হতে হবে , কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صلوا كما رأيتموني أصلى»

"তোমরা সেভাবে সালাত পড় যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখ।" (সহীহ বুখারী)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল ও সালাত আদায় করল তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিরে যাও পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি সালাতই আদায় কর নি। সে তিনবার একইভাবে আদায় করল।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকটির ওপর বিধান আরোপ করলেন যে, সে সালাতই আদায় করে নি শুধু তার সালাতে স্থিরতা না থাকার কারণে। আর এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়।

অতএব সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে নামায আদায়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

বি:দ্র: আলহামদুলিল্লাহ! আধুনিক জামানায় সময় নির্ণয়ে যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলন হওয়ায় এবং নিয়মিত ওয়াক্তমাফিক আযান প্রচারিত হওয়ায় নামাযের ওয়াক্ত জানা অতি সহজতর হয়েছে।

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নামায হচ্ছে: জামাতের সাথে এবং ওয়াক্তের শুরু অর্থাৎ আউয়াল ওয়াক্তের নামায। তবে নানান বাস্তব কারণে অনেক সময় সময়মত নামায আদায় কারো পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে-তখন করণীয় সম্পর্কে দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নরূপ ফরমান পাওয়া যায়:

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার আগে এক রাকাআত (ফরজ নামাজ) পেল, সে ফজরের নামাজ পেল। (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)
আসর নামাযের সর্বনিম্ন সময়কাল:যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসরের এক রাকাআত নামাজ পেল,সে-ও আসরের নামাজ পেল।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)।
বিঃদ্রঃ রহমান রহীম আল্লাহ কত মেহেরবাণ। যিনি স্বীয় বান্দার এক রাকাত নামাযের শ্রমও যাতে বিফল না যায় তার জন্য এমন রহমপূর্ণ মাসায়িল।

৬. জামা'আতে সালাত আদায় করার গুরুত্ব

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামা'আতে আদায় করা সকল সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুরুষের জন্য ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ রহ. তার কিতাবুস সালাতে একটি ঘটনাটি বর্ণনা করেন। যার মূল বর্ণনা রয়েছে সহীহ মুসলিমে। ইমাম আহমাদ বলেন, "আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে; সে বলল হে আল্লাহর রাসূল, আমি একজন দৃষ্টি শক্তিহীন, দুর্বল শরীর এবং বৃদ্ধ মানুষ, বাড়ীও দূরে, মসজিদ ও আমার মাঝে খেজুর গাছ এবং খালও রয়েছে। অতএব, আমি বাড়ীতেই সালাত আদায় করব এই অনুমতি কি রয়েছে?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "তুমি কি আযান শুন?" সে বলল জি হ্যাঁ, তিনি বললেন: "তবে মসজিদে আসতে হবে।"

ইমাম আহমদ উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা শেষে বলেন, "যদি কারো জন্য সালাতের জামা'আত থেকে বিরত থাকার সুযোগ থাকতো তবে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বৃদ্ধ, দুর্বল শরীর, দৃষ্টি শক্তিহীন, বাড়ী দূরে অবস্থিত এবং তার ও মসজিদের মাঝে অনেক খেজুর গাছ ও খাল বিদ্যমান ব্যক্তিটিকে অনুমতি দিতেন। (ইমাম আহমদের উক্তি এ পর্যন্ত)

এই স্পষ্ট সহীহ হাদীস থেকে বোঝা যায় কারো জন্য সালাতের জামা'আত থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ ব্যক্তির ওযর গ্রহণও করতেন তবুও কোনো সুস্থ-সবল ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জামা'আত থেকে বিরত থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য হতো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তার ওযর প্রত্যাখ্যান করে তাকে মসজিদের জামাতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিলেন, আর তাঁর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

মসজিদে জামা'আতবদ্ধভাবে সালাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ "যে ব্যক্তি আযান শুনল অতঃপর শর'ঈ ওযর ব্যতীত মসজিদে উপস্থিত হলো না তার সালাত হবে না।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ)

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, শর'ঈ ওযর কী? তিনি বলেন, ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা।

বিনা ওজরে মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায আদায়কারীর প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর সতর্কবার্তা-

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: শপথ ঐ সত্তার যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি ইচ্ছা পোষণ করছি যে, কাঠ (জ্বালানী) একত্রিত করার আদেশ দিব এবং এক ব্যক্তিকে আদেশ দিব সে যেন সালাতের ইমামতী করে অতঃপর (যে মসজিদে আসে নি) আমি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট গিয়ে তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেই।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমদ "কিতাবুস সালাত"-এ বলেন, তাদের সালাত থেকে বিরত থাকা যদি বড় গুনাহ্ না হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুশিয়ারী দিতেন না।

সালাতের জামা'আত থেকে মুনাফিক ব্যক্তিই বিরত থাকত, যাদের মুনাফেকী স্পষ্ট-

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে মুসলিম অবস্থায় সাক্ষাৎ করে আনন্দ উপভোগ করবে, সে যেন সালাতসমূহের হিফাযত করে যেখানেই সালাতের আযান দেওয়া হোক না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের বিধিসম্মত পথ নির্ণয় করেছেন। আর সালাতসমূহ ঐ বিধিসম্মত পথেরই অন্তর্ভুক্ত, তোমরা যদি নিজেদের ঘরে-ঘরে সালাত পড়া শুরু কর যেমন, (জামা'আত থেকে) বিরত এ ব্যক্তিটি নিজের ঘরে সালাত আদায় করে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করলে, আর যদি তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ কর তবে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। আর আমরা তো আমাদের যুগে দেখতাম, সালাতের জামা'আত থেকে মুনাফিক ব্যক্তিই বিরত থাকত, যাদের মুনাফেকী স্পষ্ট। (আমাদের মাঝে এমন) এক ব্যক্তিও ছিল যাকে দু'জনের উপর ভর করে নিয়ে এসে (সালাতের) কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। (সহীহ মুসলিম)

মোয়াজ্জিনের আযান শুনেও জামায়াতে হাজির না হওয়ার পরিণাম:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর সতর্ক বার্তাঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ পরিস্কার জুলুম, কুফর এবং নিফাক ব্যতীত আর কিছুই নয়, যে ব্যক্তি মোয়াজ্জিনের আযান শুনেও জামায়াতে হাজির হলো না (আহামাদ)

গুরুতর ওজর ব্যতিত জুমার নামায ও জামায়াতে শরীক না হওয়া মুনাফিকের আলামত

ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, জনৈক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে ও সারা রাত নফল নামায পড়ে। অথচ জুমা ও জামায়াতের সাথে নামাযে শরীক হয় না। তার বিষয় কী বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।**[৮৪]

ভাবনার বিষয় এই যে, রহমাতুল্লিল 'আলামীন, যিনি সারা বিশ্বের জন্যই যেখানে রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ বিশ্ব জগতজুড়েই তিনি মহান আল্লাহর অশেষ রহমত (দয়ার সাগর)- যাঁর আচরণে কাট্টা কাফের পর্যন্ত শান্তি-স্বস্তি এবং

নিরাপত্তা পেতেন। উম্মতের সামান্য দুঃখ-কষ্টও যাঁর ছিল অসহনীয়- কাল কেয়ামতের পর কঠিন হিসাব নিকাশ তথা হাশর দিবসে সকলে যখন ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি বলে হয়রান-পেরেশান হয়ে যাবেন, সেই মহাবিপদকালেও রউফুর রহিম-দয়াল নবী স্বীয় উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে কেবল একটা দোয়াই করতে থাকবেন: রব্বি হাবলি উম‘আয় আমার প্রতিপালক (রব) আমার উম্মতকে রক্ষা করুন’- এমন দয়াল নবী, দয়ার সাগর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত: যারা বিনা কারণে কেবলমাত্র মসজিদে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ে গাফেলতি (অলসতা) করে, তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে নামাযের জামায়াতের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

৬.১. নারীদের ওপর ফরয বা যেকোন নামাযই জামা‘আতে আদায় করা ওয়াজিব নয়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্যও নারীদের মসজিদে না গিয়ে ঘরে পড়লেই বেশি সওয়াব। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অসংখ্য হাদিসে নারীদের পর্দা করার অত্যধিক তাগিদ করা হয়েছে। সেসব আয়াত ও হাদিস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যত দূর সম্ভব নারীদের নিজ গৃহে অবস্থান জরুরি। নারীদের মসজিদে আসার প্রতি রাসুল (সা.) এর নিরুৎসাহ প্রদান করেন। যেমন-

হজরত আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘ক্ষুদ্র কক্ষে নারীদের নামাজ বড় কামরার নামাজের তুলনায় উত্তম। ঘরের নির্জন কোণে নামাজ ক্ষুদ্র কক্ষের নামাজের তুলনায় উত্তম। ’ [৮৫]

উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘নারীদের নামাজের উত্তম জায়গা হলো তাদের ঘরের নির্জন কোণ। [৮৬]

৬.২. নফল ও সুন্নাত নামায নিজ ঘরে অবস্থানে আদায় উত্তম

হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরজ) নামাজ সম্পন্ন করে তখন তার উচিত সে যেন তার নামাজের কিছু অংশ (সুন্নাত নামাজ) নিজের বাড়ির জন্য রাখে। কারণ বাড়িতে আদায় করা কিছু নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।’ (মুসলিম)
হজরত যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিজ ঘরে নামাজ আদায় কর। যেহেতু ফরজ নামাজ ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামাজ হলো নিজ ঘরে আদায় করা নামাজ।’ (নাসাঈ)।

৭. নামাযে একাগ্রতার গুরুত্ব

প্রতিটি কাজে সফলতার জন্য মৌলিক শর্ত হ’ল একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা। আর এ বিষয়টি নামাযেরর ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের জন্য একাগ্রতার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখজনক হ’লেও সত্য যে, বর্তমানে এই ব্যস্ত যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ একাগ্রতাবিহীন

নামায শুধুমাত্র দায়সারা ও শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা ব্যতীত তেমন কিছুই বয়ে আনে না। হৃদয়ে সৃষ্টি করে না প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করার অনাবিল প্রশান্তি। সঞ্চারিত হয় না নেকী অর্জনের পথে অগ্রগামী হওয়ার এবং যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অনুপ্রেরণা। সার্বিক অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে রাসূল (সা:)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি একটি কঠিন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন: 'এই উম্মত হ'তে সর্বপ্রথম সালাতের একাগ্রতাকে উঠিয়ে নেয়া হবে, এমনকি তুমি তাদের মধ্যে কোন একাগ্রচিত্ত মুসল্লী খুঁজে পাবে না'। [৮৭]

একই বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে। তিনি বলেন: 'সর্বপ্রথম তোমরা সালাতে একাগ্রতা হারাবে। অবশেষে হারাবে সালাত। অধিকাংশ সালাত আদায়কারীর মধ্যে কোন কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না। হয়তো মসজিদে প্রবেশ করে একজন বিনয়ী-একাগ্রতা সম্পন্ন সালাত আদায়কারীকেও পাওয়া যাবে না'। [৮৮]

বস্ততঃ **খুশূবিহীন সালাত বান্দাকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে না।** তাইতো আল্লাহ তা'আলা একাগ্রচিত্তের অধিকারী মুসল্লীদেরকেই সফল মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৭.১. খুশূ বা একাগ্রতার পরিচয়:

'খুশূ'-এর আভিধানিক অর্থ হ'ল দীনতার সাথে অবনত হওয়া, ধীরস্থির হওয়া ইত্যাদি। ইবনু কাছীর বলেন: খুশূ অর্থ- স্থিরতা, ধীরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় ও নম্রতা। [৮৯]

ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন: খুশূ হ'ল হৃদয়কে দীনতা ও বিনয়ের সাথে প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থাপন করা। [৯০]

প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়া এবং তার প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করার আবশ্যিক শর্ত হ'ল খুশূ। আর শ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাতের ক্ষেত্রে এর আবশ্যিকতা যে কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন: 'তোমরা আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হও বিনীতভাবে' [বাক্বারাহ ২/২৩৮]

তিনি আরো বলেন: 'ঐ সকল মুমিন সফলকাম, যারা সালাতে বিনয়াবনত' [মুমিনূন ২৩/১-২]

খুশূ বা একাগ্রতার স্থান হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে। কিন্তু এর প্রভাব বিকশিত হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। অন্যমনস্ক হওয়ার দরুন আত্মিক জগতে বিঘ্ন সৃষ্টি হ'লে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তার কুপ্রভাব পড়ে। তাই হৃদয় জগতকে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হ'লেই সালাতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া সম্ভব। সালাতের মধ্যে খুশূ কেবল তারই অর্জিত হবে, যে সবকিছু ত্যাগ করে নিজেকে শুধুমাত্র সালাতের জন্য নিবিষ্ট করে নিবে এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে সালাতকে স্থান দিবে। তখনই সালাত তার অন্তরকে প্রশান্তিতে ভরে দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলতেন: 'সালাতেই আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে'। [৯১]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মনোনীত বান্দাদের আলোচনায় 'খুশূ-খুযু'র সাথে সালাত আদায়কারী নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত ক্ষমা ও সুমহান প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন: ''নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার''। [আহযাব ৩৩/৩৫]

'খুশূ' বান্দার উপর সালাতের এই কঠিন দায়িত্বকে স্বাভাবিক ও প্রশান্তিময় করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই তা বিনয়ী-একনিষ্ঠ ব্যতীত অন্যদের উপর অতীব কষ্টকর'। [বাক্বারা ২/৪৫]

বস্তুতঃ যেকোন ইবাদতের ক্ষেত্রে যখন রাসূল (সা:)-এর নিম্নোক্ত বাণীর অনুসরণ করা হবে, তখনই তা এক সফল ইবাদতে পরিণত হবে। হৃদয়জগতকে অপার্থিব আলোয় উদ্ভাসিত করবে। তিনি বলেন: 'আল্লাহর ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না পাও, তবে তিনি যেন তোমাকে দেখছেন'। [৯২]

৭.১.১, একাগ্রতাপূর্ণ নামাযের ফযীলত:

খুশূ-খুযূ পূর্ণ সালাত আদায়কারীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: 'আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। অতএব যে ভাল করে ওযূ করবে, সময় মত সালাত আদায় করবে এবং রুকূ-সিজদা সঠিকভাবে আদায় করবে, আল্লাহর দায়িত্ব তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যে এমনটি করবে না, তার প্রতি আল্লাহর কোন দায়িত্ব নেই। তিনি শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন'। [৭৫ঐ]

রাসূল (সা:) আরো বলেন: 'যে সুন্দরভাবে ওযূ করে, অতঃপর মন ও শরীর একত্র করে (একাগ্রতার সাথে) দু'রাক'আত সালাত আদায় করে, (অন্য বর্ণনায় এসেছে- যে সালাতে ওয়াসওয়াসা স্থান পায় না) তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়)'। [৯৩] **[৯৪]

৭.২. একাগ্রচিত্ত নামাযের বাস্তব উদাহরণ

৭.২.১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি যে আমল খুব প্রশান্তি দিতো তা হচ্ছে নামায। এই নামাযেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন হৃদয়ের প্রশান্তি, চোখের শীতলতা। দিনের আলোতে কি রাতের আঁধারে, রবের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার মাঝে তিনি যে প্রশান্তি পেতেন, তা অতুলনীয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অধিক শুকরিয়া আদায়কারী। সর্বক্ষন আল্লাহ তাআলার মহান নিয়ামত গুলোর শোকর আদায় করতেন। আল্লাহ প্রদত্ত নিইয়ামত গুলোর জন্য তাঁর কর্ম ছিল খুবই সংগতিপূর্ণ। এ কারনে তাঁর শোকর আদায় শুধু মৌখিক শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁর শোকর আদায় ছিল বাস্তব, জীবন্ত এবং জীবনযাপনের সাথে জড়িত। এ কারণে আমরা তাঁর জীবনে দেখি, তিনি একাধারে সেজদাকারী, করুকুকারী আল্লাহতায়ালার ইবাদতকারী। কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনকারী। আল্লাহতাআলার প্রশংসা জ্ঞাপনকারী। কুরআনুল কারিমে যে সকল আয়াতে ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সে সকল আয়াতের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

হে মুমিনগণ, রুকু করো, সেজদা করো, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং সৎকর্ম করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো। [সুরা হজ্জ : ৭৭]।

অনেক হাদিস ও ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, যেগুলো আমাদের সামনে রাসলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের প্রকৃত অবস্থা ফুটিয়ে তোলে। যেমন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত অধিক নামায আদায় করতেন যে, তার দুটি পা ফুলে যেত। একদিন আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন এমনটা করেন! অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

''আমি কি একজন শোকর আদায়কারী বান্দা হতে চাই না?'' [৯৫]

তাঁর এই সুন্দর অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে আল্লাহতায়ালার ইবাদতের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি কখনোই ইবাদতকে নিছক কর্তব্য বলে মনে করতেন না। বরং তিনি নামাযে দাঁড়াতেন ভালোবাসা নিয়ে। নিজের উৎফুল্লতা ও আগ্রহ নিয়ে, গভীর মমতা নিয়ে। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. আরেকটি হাদিসে নবীজির রাতের নামাজের চিত্র ও ধরন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এ ছিল তাঁর রাত্রিকালীন নামাজ। এতে তিনি এত দীর্ঘ সেজদা করতেন যে, তাঁর মাথা ওঠানোর পূর্বে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারে এবং ফজরের নামাজের পূর্বে তিনি আরও দু-রাকাত পড়তেন। অতঃপর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন, নামাজের জন্য মুআজ্জিন মসজিদে আসা পর্যন্ত। [৯৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক নামাজ ও অধিক কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে প্রশান্তি পেতেন। যেমন হজরত হুজাইফা রা. বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি নবীজির সাথে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করলাম। তিনি সুরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম তিনি হয়তো একশ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু এর পরেও তিনি পড়তে থাকলেন। তখন আমি ভাবলাম তিনি এর (সুরা বাকারা) দ্বারা পুরো দুরাকাত পড়ে সালাম ফেরাবেন। কিন্তু তিনি এরপরও পড়তে থাকলেন। এবার আমি ভাবলাম সুরাটি শেষ করে তিনি হয়তো রুকু করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সুরা নিসা'-ও পড়তে শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন। অতঃপর তিনি সুরা আলে ইমরান' শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন। তিনি থেমে থেমে ধীরে পড়ছিলেন এবং কোন তাসবিহর আয়াত এলে তাসবিহ পড়ছিলেন, কিছু চাওয়ার আয়াত এলে কিছু চাইছিলেন। যখন আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পড়ছিলেন, তখন আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। অতঃপর তিনি রুকু করলেন। রুকুতে তিনি পড়তে থাকলেন ''সুবহানা রব্বিয়াল আযীম''। তাঁর রুকু কিয়ামের মতই দীর্ঘ্য হল। এরপর ''সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ'' বললেন। এরপর যতক্ষণ সময় রুকু করেছিলেন, প্রায় ততক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সেজদা করলেন সেজদায় পড়লেন '' সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'' তাঁর এই সিজদাও প্রায় কিয়ামের সময়ের মতো দীর্ঘায়িত হলো।'' [৯৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অধিক নামায আদায় করতেন। কেননা এই সময়টি ছিল তাঁর ও তাঁর প্রতিপালকের একান্ত মুহূর্ত। এ কারণে তিনি রাতের নামাজ সম্পর্কে বলেন,

«أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل

'' ফরয নামায গুলোর পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হলো রাতের নামায ''। [৯৮]

রাতের নামাজের সীমাহীন পছন্দের কারণে তার যদি কোন কারণে কোন নামাজ কাজা হয়ে যেত, তাহলে তিনি সেটা প্রভাতে আদায় করে নিতেন। যেমন হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة «

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নফল নামায আদায় করলে, তা নিয়মিত আদায় করা পছন্দ করতেন। তবে যদি কোনদিন ঘুম বেশি হয়ে যেত অথবা তীব্র ব্যথা দেখা দিত, যাতে তাঁর জন্যে রাতে দাঁড়ানো সম্ভব হতোনা, তাহলে তিনি। দিনে বারো রাকাত নামাজ আদায় করে নিতেন। [৯৯]

নামাযের প্রতি নবীজির এই বিশেষ ভালোবাসা আরও ভালো করে বোঝা যায় বিলাল রাঃ কে তাঁর এ কথা বলার মাধ্যমে- "হে বেলাল, তুমি দাঁড়াও, (অজান ও ইকামত দাও) এবং নামাজে মাধ্যমে আমাদের হৃদয়কে শান্ত করো।'' [১০০] [সুনানে আবু দাউদ ৪৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ: ২৩১৩৭, আল মুজামুল কবির: ৬২১৫।]

অন্য হাদিসে রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ''আমার চোখের শীতলতা বা প্রশান্তি রাখা হয়েছে নামাযের মধ্যে। [১০১]

আচ্ছা, নামায তো আমরাও পড়ি। নামাযের জন্য প্রতিদিনই আমরা আমাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করি। কিন্তু আমাদের এই নামায কি আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করে? এমনটা কয়দিন হয়েছে, নামায পড়ে মনে খুব পরিতৃপ্তি অনুভব হয়েছে? আসলে নামাজের প্রকৃত পরিচয়টাই আমাদের অজানা। আমরা নামাযের নিয়মকানুন জানলেও জানি না কীভাবে নবীজি (সা.) নামাযকে উপভোগ করতেন। ফলে আমাদের নামায হয়ত হয়ে যায়, কিন্তু সেই নামাজে প্রাণ থাকে না। আমাদের ভিতর রেখাপাত করে না, জীবনে কোনো পরিবর্তন আনে না। আমাদের নামাযকে ফলপ্রসূ করতে হলে রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। **[১০২]

৭.২.২. সাহাবায়ে কেরামের নামাযঃ

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপদেশ চাইলে তিনি বলেন " যখন নামাযে দাঁড়াবে, জীবনের শেষ নামায মনে করে পড়বে। সাহাবাকেরাম রাঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং হুবুহু পালনে সচেষ্ট থাকতেন। তাই তাঁরা নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। রাসূল সাল্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সোহবতে তাঁদের নামায ও নামাযের বাইরের জীবন অতুলনীয় ঈমানের দ্যুতি ছড়িয়ে গেছে যা আমাদের জন্য অনুসরণীয়-

১. হযরত আবূ বকর (রা) খুটির মত নিশ্চল হয়ে নামাযে দাঁড়াতেন।

২. বল্লমের আঘাতে বেহুশ থাকা অবস্থায় হযরত ওমর (রা) কে নামাযের কথা বললে তিনি হুঁশ ফিরে পান।

৩. হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকারীদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর বিবি বললেন "তোমরা এমন লোককে হত্যা করলে যে রাতের নামাযে কুরআন খতম করতেন।

৪. হযরত আলী (রা) এর পায়ে বিদ্ধ তীর সিজদারত অবস্থায় সহজে খোলা গেল।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)অসুস্থ অবস্থায় চোখের চিকিৎসা ত্যাগ করলেন, কারণ চিকিৎসক সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সিজদা দিতে নিষেধ করেছিলেন।

৬. হযরত আবদুল্লহ ইবনে যুবাইর (রা) নিশ্চল থমের মত দাঁড়াতেন এবং বলতেন এটাই খুশু।

৭. হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) বাগানে নামাযের সময় পাখির দিকে খেয়াল করায় রাকাআতের সংখ্যা ভুলে যাওয়ার কাফফারা হিসেবে ঐ বাগানটাই আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য রাসূল সাল্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দিয়ে দিলেন।

৭.২.৩. সালাফে সালেহীনের নামায

সালাফে সালেহীনের বিনয় ও একাগ্রতার কতিপয় বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের নামাযের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখে-

১। 'আমের আবদে কায়েস আম্বারীকে বলা হলো: ''আপনি কি সালাতে স্বীয় আত্মার সাথে কথা বলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আমার আত্মা সাথে আল্লাহর সম্মুখীন এবং স্বীয় পরিণাম সম্পর্কে কথা বলি।''

২। 'আলী ইবন হুসাইন ইবন যাইনুল আবেদীন যখন সালাতে দাঁড়াতেন তার কম্পন শুরু হয়ে যেত। যখন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: ''তোমরা কি জান না যে, আমি কার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই এবং কথোপকথন করি''?

একবার তার বাড়ীতে আগুন লেগে যায় আর তিনি তখন সাজদারত ছিলেন। সাজদাহ থেকে তিনি যখন মাথা উঠান সে সময় আগুন নিভে গিয়েছিল, এ ব্যাপারে তাকে বলা হলে তিনি বলেন, ''আমাকে অন্য আরেকটি আগুনে এই আগুন থেকে বিমুখ করে রেখেছিল।''

৩। মুসলিম ইবন ইয়াসার আল বাসারী যখন সালাত আদায় করতেন মনে হতো যেন একটি কাঠ দাঁড়ানো আছে। এদিক সেদিক ঝুকতেন না এবং যখন সালাত শুরু করতেন তার পরিবারকে বলতেন: ''তোমরা কথপোকথন করকেননা আমি , তোমাদের কথা শুনতে পাই না।''

৪। আ'মাশ বলেন'' ,ইবরাহীম আত-তাইমী যখন সাজদাহ করতেন মনে হতো তিনি যেন কোনো দেওয়ালের অংশ এবং চড়ুই পাখী তাঁর পিঠে বসে যেত।''

৫। আহমদ ইবনে সিনান বলেন, ''আমি ওয়াকীকে দেখেছি যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন সামান্যতমও নড়াচড়া করতেন ' না এবং উভয় পায়ে ভর না দিয়ে শুধু এক পায়ে ভর করে ঝুঁকে যেতেন না।''

৬। ইয়া'কুব ইবন ইয়াযীদ বাসরীর একবার সালাতের অবস্থায় কাঁধ থেকে চাদর চুরি হয়ে যায় এবং তাকে এরপর ফিরিয়ে দেওয়া হয় সালাতে মগ্ন থাকার জন্য তিনি তা অনুভবও করতে পারেন নি। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন। কিন্তু ,

৭। মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব বলেন, ''আমি মুহাম্মাদ ইবন নাসর মারওয়াযীর চেয়ে উত্তম সালাত আদায়কারী অন্য কাউকে দেখি নি, তার কানে মাছি বসতো এবং রক্ত বয়ে যেত, কিন্তু তিনি মাছিকে সরাতেন না, অতঃপর তিনি বলেন, তিনি স্বীয় চিবুক (থুৎনি) বুকে রেখে এমনভাবে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন যে মনে হতো তিনি একটি স্থাপনকৃত কাঠ।'' **[১০৩]

৮. নামাজ না পড়ার পরিনতি

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ وابن مَاجَةَ

বুরায়দাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হল সলাত। অতএব যে সলাত পরিত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কুফরী করল (অর্থাৎ কাফির হয়ে যাবে)। [১০৪]

অর্থাৎ নামায পরিত্যাগ করা কঠিন গুনাহের কাজ আর এর শাস্তিও কঠিন। নিচে নামাজ না পড়ার পরিণতি আলোচনা করা হলো-

(১) বেনামাযীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, যেমন সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে: ''তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমাত।

কত বড় শাস্তি! শুধু এই জন্য যে বেনামাযী ফরয সালাতকে মাথায় বড় বোঝা মনে করত, তাই মাথায় পাথর মেরে মেরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

(২) কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে:

''যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির'আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।'' [১৮ঐ] (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম আহমদ রহ. এ হাদীসকে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরীর ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা বড় বড় কাফিরদের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার জন্য তার কুফুরী সাব্যস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, ''এই চার জনকে বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের নেতা।

(৩) বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣﴾ [المدثر: ٤٢، ٤٣

''তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।'' [১০৫]

(৪) বেনামাযী স্বীয় পরিবার এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»

''যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।'' (সহীহ মুসলিম)

অতএব, যে সমস্ত সালাত ছেড়ে দেয় তার কি অবস্থা হবে?

(৫) বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক খালে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩ ﴾ [مريم: ٥٩

''তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই ''গাইয়া'' প্রত্যক্ষ করবে।'' [১০৬]

আপনি কি জানেন ''গাইয়া'' কী? গাইয়া হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ। **[১০৭] (তাফসীর ইবন কাসীর)

গাইয়ার উক্ত তাফসীর আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইবনুল কাইয়্যেম রহ. কিতাবুস সালাতে উল্লেখ করেছেন।

সালাত পরিত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান: সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয। তার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত, তার জবাহকৃত গোশত খাওয়া নাজায়েয, সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না। তেমনি তার আত্মীয়গণও তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না, মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না, তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো'আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ওয়াজিব। **[১০৮]

৮.১. নেফাকিপূর্ন নামাযের ব্যাপারে সতর্কতাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়া'লা ইরশাদ করেন-

اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ يُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمۡ ۚ وَ اِذَا قَامُوۡۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوۡا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوۡنَ النَّاسَ وَ لَا يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيۡلًا ﴿۱۴۲﴾ۙ

'নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।' (সূরা-নিসা: ১৪২)

অর্থাৎ নামাযে অলস অমনযোগী ভাবে দাঁড়ানো নেফাকির আলামত। নেফাকি হলো অন্তরের এমন একটা ব্যাধি, যা ঈমানের নূর ও এর থেকে পুরোপুরি উপকৃত হবার পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধক। বর্তমান সময়ের মুসলিমদের মধ্যে এই ব্যাধিটা সবচে প্রকট। এর ঘাড়ে সওয়ার হয়ে পরবর্তীতে অন্য আরো অনেক ব্যাধি একজন ব্যক্তির মনে বাসা বাঁধে। নামায আদায় করাই কিন্তু শেষ কথা নয়। এই আয়াত থেকে বুঝে আসে, নামায আদায়কারী হয়েও একজন মানুষ নিফাকে আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে দেখার বিষয় হলো, সেই নামায কতটুকু নিজ আগ্রহ-উদ্দীপনায় আর কতটুকু পরিবার-সমাজের লোকচক্ষুর ভয়ে আদায় করা হচ্ছে। কারণ বহু মানুষ এমন আছে, যিনি কোথাও গেলে নিজের ইমেজ ঠিক রাখার জন্য হলেও নামাযটা আগে আগে বা মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করেন। কিন্তু নিজ ঘরে অবস্থানকালে হয়ত ঠিক মতো সালাত আদায়ই করেন না, অথবা কোন মতে অলসভাবে শুধু 'সেজদা মেরে' দায়িত্বমুক্ত হন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল ও সালাত আদায় করল তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিরে যাও পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি সালাতই আদায় কর নি। সে তিনবার একইভাবে আদায় করল।'' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকটির ওপর বিধান আরোপ করলেন যে, সে সালাতই আদায় করে নি শুধু তার সালাতে স্থিরতা না থাকার কারণে। আর এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়। অতএব ধীরস্থির ভাবে মনোযোগের সাথে সঠিক নিয়মে নামায আদায় করতে হবে।

মানুষের অবস্থা সবসময় সমান থাকে না। এমনও হতে পারে যে, সপ্তাহের শুরুতে নিফাকের ব্যাধি ছিল না। কিন্তু সপ্তাহান্তে তা অন্তরে উদ্গত হয়ে পুরো তনুমনকে ঝেঁকে ধরেছে। সেজন্য মাঝেমাঝে নিজের অবস্থা যাচাই করা উচিত। নিয়মিত সামান্য সময় নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তা কোন অবস্থানে আছে এটি নির্ণয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে দীর্ঘমেয়াদী ও পোক্ত নেফাকির হাত থেকে সহজেই মুক্তি সম্ভব।

৯. শেষকথা

উল্লিখিত আলোচনা পর্যালচনা প্রমাণ নামাযের গুরুত্ব, ফযীলত এবং ইহকাল ও পরকালে তার উপকারিতা ও ফলাফলের স্পষ্ট দলীল। এই ফলাফল ও ফযীলত নামাযেরর পুরোপুরি সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্বদানকারীর জন্যই অর্জন হতে পারে। হাদীসে আছে যে, জান্নাতবাসীদের একটি আফসোস ছাড়া জান্নাতে আর কোন মনোবেদনা থাকবে না। দুনিয়াতে যে সময়টা আল্লাহকে ভুলে থেকে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐ অবহেলার জন্যই আফসোস করতে থাকবে। জান্নাত তো ঐ চিরস্থায়ী বাসস্থানেরই নাম যেখানে সামান্যতম দুঃখ কষ্ট এমনকি অভাব পর্যন্ত থাকবে না। অথচ একটা বিষয়ে আফসোস থেকেই যাবে। আফসোস তো মনোবেদনারই সৃষ্টি করে। এ আফসোসের কারণ তালাশ করলে হাদীসের বিবরণ থেকে তা বুঝা যায়। আল্লাহর দীদারই বেহেশতের সকল নিয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়মাত বলে বেহেশত বাসীরা মনে করবে। আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাওয়ার চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কোনটাতেই তারা বোধ করবে না। আর সবাই সমান পরিমাণ সময় আল্লাহকে দেখতে পাবে না। যে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে যত বেশি স্মরণ করেছে সে তত বেশি সময় আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। তাই যারা কম সময় দেখার সুয়োগ পাবে তারাই হয়তো ঐরকম আফসোস করবে। তাই দুনিয়াতে যারা যতবেশি নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটবর্তী হতে পারবে তারা তারা ততবেশি সময় ধরে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأخبروا العاء

সেজদারত অবস্থায় বান্দা তার প্রতিপালকের সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জন করে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে সবচেয়ে পছন্দের আমল নামায, কারন এই নামাযের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রতিপালকের দাসত্বের প্রমাণ পেশ করতে পারে। তার রবের সাথে সরাসরি আবেদন নিবেদন পেশ করতে পারে। বান্দার সাথে তার রবের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম এই নামায। আল্লাহ্র দিদার লাভ করার মাধ্যমও নামায। কেননা হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি ফজর আসর নামায আদায়কারীর কিয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার বা সাক্ষাৎ লাভ করবে।
অতএব, আমাদের কারো নামাযের ব্যাপারে উদাসিন্য থাকলে হঠাৎ চলে আসা সমস্ত স্বাদ সাঙ্গকারী সকল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নকারী মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই আমাদের একান্ত তাওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। নতুবা শুধু আফসোস আর লজ্জা ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। নিম্নোক্ত আয়াত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করি:

﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ
ٱلرَّحِيمُ ٥٣ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ
إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةً وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ٥٥ أَن تَقُولَ نَفۡسٞ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي

جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ ٥٦ أَوۡ تَقُولَ لَوۡ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٥٧ أَوۡ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلۡعَذَابَ لَوۡ أَنَّ لِي كَرَّةٗ فَأَكُونَ مِنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٨ ﴾ [الزمر: ٥٣، ٥٨]

"বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসবার পূর্বে; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে। যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩-৫৮]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ-খাতা থেকে তাওবা করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদা করছেন। কিন্তু তাওবা করার পরে কি করা উচিৎ? আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব, তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওবার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা থেকে সাবধান করেন। কেননা মৃত্যু এমন সময় এসে পড়বে যে মানুষ তা বুঝতেও পারবে না, পরে তার জন্য আফসোস ও লজ্জা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না।

﴿أَن تَقُولَ نَفۡسٞ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]

"যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস!" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৬]

নামাযে শিথিলতাকারী বলবে: হায় আফসোস! আমি নামাযে বা নামাযের জামা'আতে, ফজরের নামাযে বা তা ব্যতীত আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণে শৈথিল্য করেছি। আর ঐ ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ-খাতার জন্য আফসোস করবে।

অতএব, আমাদের সবার কর্তব্য, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]

"হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ্তায়া'লা আমাদেরকে নামায ও এর খুশূ' (বিনম্রতা) হেফাজতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুক। পাশাপাশি তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালনে সক্ষম করুক। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

❖ **তথ্যসূত্রঃ**

[১] (সূরা আল-বাকারাহ, ২/ ১৪৩ ; তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

[২] (সূত্র: বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৯, ৩৩৪২, ৩৮৮৭; মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩ ও ২৬৪; ফাতহুল বারি: ৭/২৫০-২৫৯, মা'আরেফুল কোরআন : ৭৬৪-৭৬৫, সিরাতে মুস্তফা)।

[৩] "(সূরাহ-ত্ব-হা, ২০/১৪, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ৬ষ্ঠখন্ড, পৃষ্ঠা: ৬২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)।

[৪] সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮/১৩, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৮) ।

[৫] (সূরাহ বাক্বরাহ, ২/১১০, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৭১)।

[৬] [বুখারীঃ ৮, মুসলিমঃ ২১] হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

[৭] সহীহ: আহমাদ ২২৭০৪, আবূ দাউদ ৪২৫, মালিক ১৪, নাসায়ী ৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৭০। হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

[৮] পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সালাত বা নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত (প্রথমখন্ড) মুহাম্মদ শেখ রমজান হোসেন। [সহায়ক গ্রন্থ]

[৯] মনের মতো সালাত। মূল- খালিদ আবূ শাদী, অনুবাদ- আহমদ ইউসুফ শরীফ। [সহায়ক গ্রন্থ]

[১০] (সূরাহ তাহরীম, আয়াতঃ ৬, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৫০৭)।

[১১] (জামে তিরমিযী, হাদিস নং-৩৮২)

[১২] (সূরাহ মুনাফিকুন, আয়াত ৯, তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন), ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা:৪৫৮, মূল: মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রহ.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

[১৩] (সূত্রঃ ১. কিতাবুল কাবায়ির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ২. সূত্রঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তিঃ আবদুল হালিম খাঁ, প্রথম সংস্করণ)।

[১৪] সহীহ : বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৮৫, নাসায়ী ৬১০, আহমাদ ৩৮৯০, ইরওয়া ১১৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৯৭।

[১৫] (তাবারানি)

[১৬] (ই.ফা. ৯৭৫, ই.সে. ৯৮৬) হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

[১৭](মুসনাদে আহমদ)

[১৮](মুসনাদে ইমাম আহমদ)

[১৯] [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

[২০] [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]

[২১] [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫]

[২২] (মুখতাসারুস সিরাহ, শেখ আবদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৮৮)।

[২৩] (তথ্যসূত্রঃ ১.ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭)

[২৪] তথ্যসূত্রঃ পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সালাত বা নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত (প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ড)- মুহাম্মদ শেখ রমজান হোসেন।

[২৫] (সহীহ; মুসলিম৮২, আবূ দাউদ ৪৬৭৮, নাসায়ী ৪৬৪, তিরমিযী ২৬২০, ইবনু মাজাহ ১০৭৮)

[২৬] (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ) [২৭] (সুনান তিরমিযী)

[২৮] (বাইহাকী হাদীসটিকে তার শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন)

[২৯] (ইমাম আহমদের কিতাবুস সালাত)

[৩০] (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

[৩১] [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১৯]

[৩২] (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

[৩৩] (সহীহ মুসলিম)

[৩৪] সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮

[৩৫] (মুসনাদে আহমদ) ; [৩৬] (সুনান নাসাঈ); [৩৭] [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

[৩৮] [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]; [৩৯](মুসনাদে আহমদ) [৪০] (তাফসীর ইবন কাসীর)

[৪১] [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২] [৪২](মুসনাদ আহমদ) [৪৩] [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]

[৪৪] [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫] [৪৫] [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

[৪৬] [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৪৫] [৪৭] (সুনান আবু দাউদ)

[৪৮] [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]; [৪৯] (সহীহ মুসলিম)

[৫০] [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

[৫১] **[সহায়ক গ্রন্থ] ''নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত''লেখক:আব্দুল্লাহ ইবন সা'দ আল ফালেহ-অনুবাদ-মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান।

[৫২] (সুরা রূম-৩০/ ১৭,১৮) ; [৫৩] (তাফসীর- ফাতহুল ক্বাদীর); [৫৪] (যয়ীফ আবু দাউদ ১০৮১নং)

[৫৫] [সূরা বনী ইসরাঈল (১৭:৭৮)] ;

[৫৬] (বুখারী, কিতাবুল মাওয়াকীত, মুসলিম, পরিচ্ছেদঃ আসর ও ফজরের নামাযের ফযীলত---)

**[৫৭] [সহায়ক সূত্র -তাফসিরে আহসানুল বায়ান]

[৫৮] [সূরা আল-আ'রাফ (০৭:২০৫)] ; [৫৯] [সূরা আর-রূম (৩০:১৭)] ; [৬০] [সূরা ছোয়াদ (৩৮:১৮)]

[৬১] সূরা ক্বাফ [(৫০:৩৯)];

(বিঃদ্রঃ পরবর্তী তথ্যসূত্র গুলো মূল লেখার পাশে দেওয়া আছে, এরাবিক গুরুতবপূর্ণ দলিল গুলো আলাদা করা হয়েছে।)

[৬২] [iHadis.com ১৭৫] বুখারী ৫৫৪, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৫৩৬; মুসলিম ৬৩৩, তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৩৭২৯, আহমাদ ১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭২৬। তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ।

[৬৩] [মিশকাত-(৬১৩), সহীহ্ আবূ দাউদ-(৪৪৫)। হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস]

[৬৪] [iHadis.com-165 মিশকাত-(৬১৩), সহীহ্ আবূ দাউদ-(৪৪৫), হাদিসের মানঃ সহীহ্।]

[৬৫] (সুনানু তিরমিযি-৫৮৬); [৬৬] (সুনানু তিরমিযি-৫৮৫)

[৬৭] (সুনানু তিরমিযি-৪৭৫); [৬৮] (সুনানু-তিরমিযি-৫৯৮); [৬৯] (সুনানু তিরমিযি-৪৭৩)

[৭০] (সুনানু তিরমিযি-৪৭৪); [৭১] (সহীহ মুসলিম-৭১৯)।

[৭২] [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]
[৭৩] [আল-বুখারী, খণ্ড: ১, অধ্যায়: ৭ "ওয়াক্ত মতো সালাত আদায় না করা সালাতকে বিনষ্ট করা", হাদীস: ৩২৫]
[৭৪] [আল-বুখারী, খণ্ড : ১, অধ্যায় : ৭ "ওয়াক্তমতো সালাত আদায় না করা সালাতকে বিনষ্ট করা", হাদীস : ৩২৬]
[৭৫] সহীহ: আহমাদ হা/২২৭০৪, আবূ দাউদ ৪২৫, মিশকাত হা/৫৭০। মালিক ১৪, নাসায়ী হা/৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৭০।
[৭৬] আত-তাবারানী কর্তৃক আল-কাবীর গ্রন্থে এবং আহ্মাদ কর্তৃক আল-আওসাত গ্রন্থে বর্ণিত। সহীহুত তারগীব ওয়াত-তাহ্রীব (হাদীস : ৩৯৭) গ্রন্থেও রয়েছে।]
[৭৭] [আত-তাবারানী কর্তৃক আল-কাবীর গ্রন্থে বর্ণিত। সহীহুত তারগীব ওয়াত-তাহ্রীব (হাদীস : ৩৯৮) গ্রন্থেও রয়েছে।]
**[৭৮] [সহায়ক সূত্র : আস্-সালাত ওয়া আসারুহা ফী যিয়াদাতিল ঈমান (ইংরেজী ভাষান্তর : আবু ঈয়াদ)লেখক: হুসাইন আল-আওয়াঈশাহ্ | অনুবাদক: মোছতানছের বিল্লাহ্]
[৭৯] [সূরা আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫] **[৮০] (তাফসীর ইবন কাসীর)
[৮১] (সূত্রঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তিঃ আবদুল হালিম খাঁ, প্রথম সংস্করণ)।

[৮২] (সূরাহ মারিয়াম, আয়াতঃ ৫৯ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, মূল: মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) অনুবাদে:মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪০, প্রথম প্রকাশ, ৯ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)।
**[৮৩] (সূত্রঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তিঃ আবদুল হালিম খাঁ)।
**[৮৪] (জামে তিরমিযী, সূত্রঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তিঃ আবদুল হালিম খাঁ, প্রথম সংস্করণ)।

[৮৫] [আবু দাউদ, হাদিস: ৫৭০ (হাদিসটি সহিহ)]

[৮৬] [মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৬৫৪২ (হাদিসটি হাসান)]
[৮৭] ত্বাবারাণী; ছহীহুল জামে‘ হা/২৫৬৯।
[৮৮] ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৬), ১/৫১৭ পৃঃ।
[৮৯]. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম (দার তাইয়েবা, ১৪২০/১৯৯৯, ২য় সংস্করণ), ৬/৪১৮ পৃঃ।
[৯০]. মাদারিজুস সালেকীন ১/৫১৬ পৃঃ।
[৯১] আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ হাসান।
[৯২] বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।
[৯৩] নাসাঈ হা/১৫১; বুখারী হা/১৯৩৪; মিশকাত হা/২৮৭।
**[৯৪][সহায়ক সূত্রঃ সালাতে একাগ্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও উপায়। লিখেছেন : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব from QuranerAlo.com
[৯৫] [সহিহ বুখারিঃ হা/৪৮৩৭, সহিহ মুসলিম হা/ ২৮২০]
[৯৬] [সহিহ বুখারিঃ ৯৯৪, সুনানে আবু দাউদঃ ১৩৩৬]
[৯৭] [সহিহ মুসলিমঃ হা/৭৭২ ,সুনানে নাসায়িঃ হা/১১১৩, মুসনাদে আহমদঃ হা/২৩৪১৫]
[৯৮] [সুনানে আবু দাউদ: ২৪২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৪৮৮]
[৯৯] [সহিহ মুসলিম : ৭৪৬, মুসনাদে আহমাদ : ২৪৩১৪, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৫৫২।]
[১০০] [সুনানে আবু দাউদ ৪৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ: ২৩১৩৭, আল মুজামুল কবির: ৬২১৫।]
[১০১] [মুসনাদে আহমাদ : ১৩৫২৬, সুনানে নাসায়ি ; ৩৯৩৯, আল মুজামুল কাবির : ১৭৩৮৮।]
**[১০২] [সহায়ক গ্রন্থ- উসওয়াতুল লিল আলামিন-ডঃ রাগিব সারজানি; অনুবাদ-শামীম আহমাদ।মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনা]
**[১০৩] [সহায়ক সূত্রঃ (ইমাম যাহাবী রহ-এর “সিয়ারু আলামিন নুবালা” এর তাহযীব, মুহাম্মাদ ইবন হাসান ইবন আকীলের “নুযহাতুল ফুযালা” থেকে সংকলিত)]
[১০৪] [মিশকাতুলমাসাবিহ-পর্ব-৪ঃ সালাত-৫৭৪, হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস]
[১০৫] [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩]
[১০৬] [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯]

**[১০৭] (তাফসীর ইবন কাসীর)

**[১০৮] (শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনের ‘‘সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান’’ নামক রিসালা থেকে সংকলিত)

Assignment prepared by-
Mst. …………………….
Batch-1902
Roll no.- 1902034
Islamic online Madrasah
Address- 11 no Sector. Uttara ,
Dhaka,
Phone-………………………

